আমরাও হতে পারি



বীক্ষণ বিশারদ

কমলেশ রায়

আমরাও হতে পারি

চতুর্থ বই

কমলেশ রায়

বীক্ষণ-বিশারদ

"স্বাক্ষর" প্রকাশিত : "বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স" পরিবেশিত।

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৫৬

প্রকাশক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা, ২০ ॥। মুদ্রাকর শ্রীঅরবিন্দ সরদার, শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮।৩ চিন্তামনি দাস লেন, কলকাতা ৯ ॥। বাঁধাই : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম ঃ আড়াই টাকা

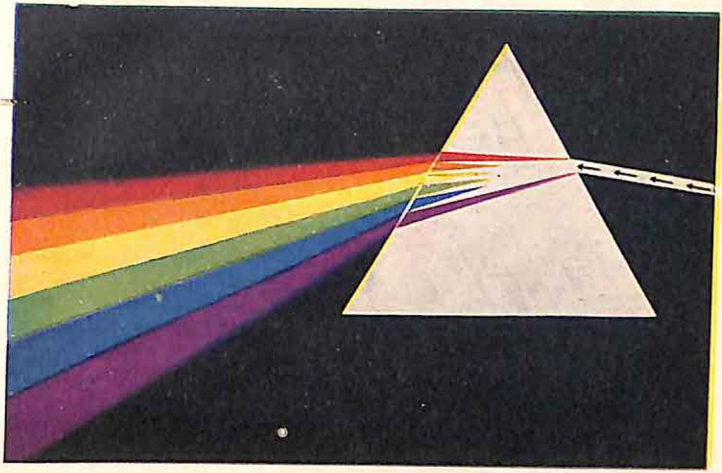
প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী



বীক্ষণ বিশারদ

কমলেশ রায়

"আমরাও হতে পারি" : গ্রন্থমালা ছেলেমেয়েদের নানান শিল্পের টেকনিসিয়ান হয়ে ওঠার ইচ্ছাকে আরো উৎসাহ দেবে। এই গ্রন্থমালায় পর-পর বেরুবে। বিদ্যুৎ-বিশারদ॥ মোটর ইঞ্জিনিয়ার॥ বীক্ষণ-বিশারদ॥ পাইলট॥ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার॥ মুদ্রণ-বিশারদ॥ ফোটোগ্রাফার॥ অজস্র ছবি। দাম দু টাকা।



ত্রিকোণ-কাচ বা prism-এর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সূর্যের আলো রামধনুর সাত-রঙে বিভক্ত হয়ে যায়—সূর্যের সাদা আলো ওই সাত-রঙ-এর সংমিশ্রণ। সাতটি আলো হলো : বেগুনি (Violet), নীল (Indigo), আশমানী (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red)। সাদা আলোকে বিশ্লেষণ করে যে আলোর স্তর পাওয়া যায় তাকে বলে বর্ণছত্র বা বর্ণালী (Spectrum)। আলোগুলি এ-ভাবে বিভক্ত হয় কেন? কেননা ত্রিকোণ কাচের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন আলো বিভিন্ন কোণ বা angleএ বাঁকে : লাল বাঁকে সবচেয়ে কম, বেগুনি সবচেয়ে বেশি।

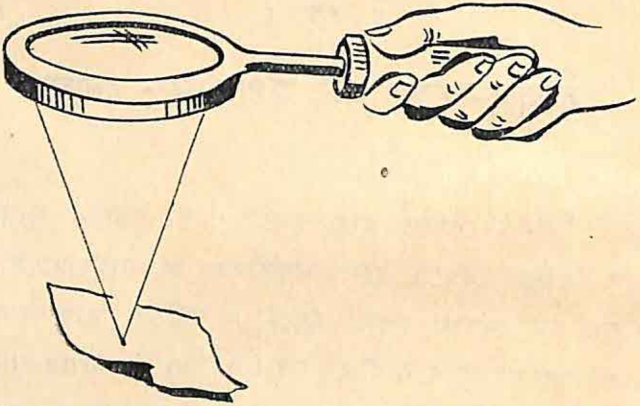
॥ এক ॥

বীক্ষণ-যন্ত্রের মূল উপাদান : লেন্স

দূরের জিনিস দেখতে হলে দূরবীক্ষণ বা দূরবীন লাগাও, ক্ষুদে জিনিস দেখতে হলে অনুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ। চোখে কম দেখলে চশমা আঁটো। দৃষ্টিকে সাহায্য করে যে-সব যন্ত্র তাদের বলে বীক্ষণ-যন্ত্র (optical instrument)। বীক্ষণ মানে দেখা, বিশেষভাবে দেখা। ক্যামেরাও একটা বীক্ষণ-যন্ত্র। কিন্তু, ক্যামেরা কি আমরা দূরবীন বা চশমার মতো চোখে লাগিয়ে দেখি? তা নয়। তবুও ক্যামেরা কি আমাদের বিশেষভাবে দেখতে সাহায্য করে না? যে মানুষ কাছে নেই তাকে দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরায় তোলা ছবি দিয়ে, যে দেশ দেখি নি সে দেশের মানুষ, নদী, পাহাড়, পথঘাট, সবই দেখছি ফোটো দিয়ে। তেমনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস, সিনেমা প্রজেক্টর, এমনকি আয়নাও বীক্ষণ-যন্ত্র। আয়নাও নানা রকমের হয়। দাড়িকামানোর একরকম আয়না আছে—তাতে? মুখটা মস্তো বড়ো হাঁড়ির মতো দেখায়।

আবার মোটরগাড়িতে একরকম গোল আয়না থাকে, তা দিয়ে পিছনের গাড়ি, মানুষ সব ক্ষুদে ক্ষুদে-দেখায়।

চোখ দিয়ে আমরা দেখি। কিন্তু চোখ থাকলেও আলো ছাড়া কিছু দেখবার জো নেই। বীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে যখন



1 নং চিত্র : আতস কাচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সূর্যের আলো ঘনীভূত করা

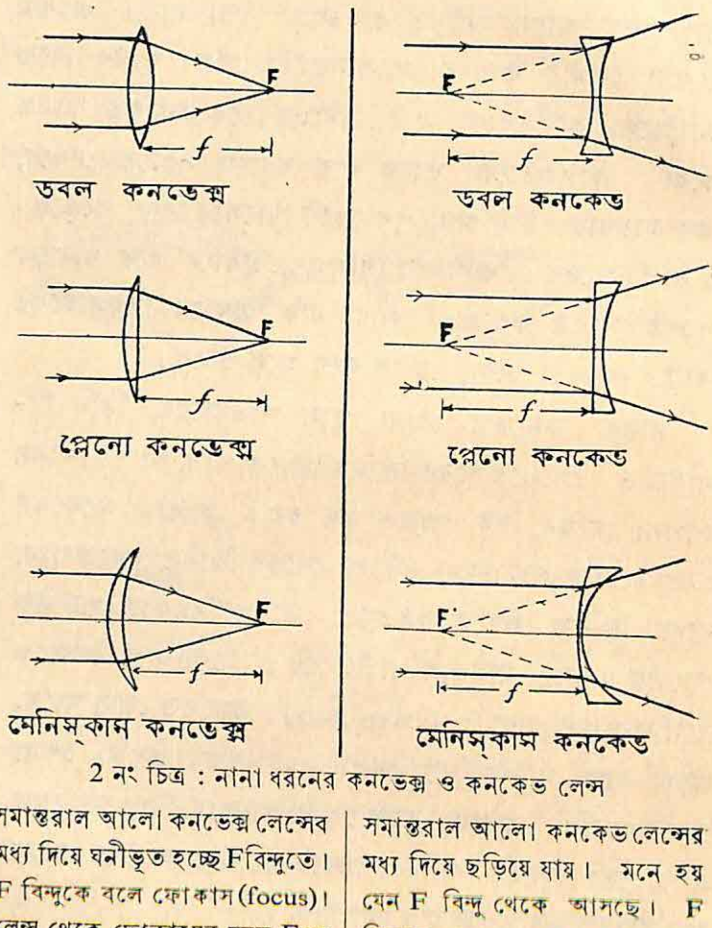
আমরা দেখবার ক্ষমতা বাড়াই তখন চোখের তেজ কিছু বাড়ে না, শুধু আলোকে কোনো-না কোনো রকমে নিয়ন্ত্রণ করে দেখবার সুবিধা করে নিই। প্রায় সব রকম বীক্ষণযন্ত্রে একটা না একটা লেন্স (lens) থাকে। শুধু তাই নয়, আমাদের চোখের মধ্যেও একটা লেন্স আছে।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস একটা পেটমোটা লেন্স ছাড়া আর কিছু নয়। দাদুর চশমাও ঐ ধরনের লেন্স। পেটমোটা লেন্সকে বলে কনভেক্স লেন্স (Convex lens)। কনভেক্স

লেন্স দিয়ে আলো ঘনীভূত বা জড়ো করা যায়। এরকম একটা চশমার কাচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস সূর্যের দিকে চ্যাটালো করে রোদে ধরো, নিচের দিকে এক খণ্ড কাগজ ধরো। কাগজটাকে কাছে দূরে সরাতে সরাতে দেখবে, এক জায়গায় ছোট্ট অথচ খুব তেজী আলোর বিন্দু পড়েছে। ১ নং চিত্র দেখ। কাগজটা বেশিক্ষণ ঐখানে ধরে থাকলে পুড়তে আরম্ভ করবে। আর যদি ঐখানে দিশলাইয়ের কাঠির বারুরটা ধরো, ফোঁস করে জ্বলে উঠবে।

দাদুর কনভেক্স চশমা প্লাস পাওয়ারের, তিনি লং-সাইটেড। এমনিতে দূরের জিনিস দেখতে পান, কাছের জিনিস ঝাপসা দেখেন, বই পড়তে কষ্ট হয়। আবার অনেকের চোখের দোষ অন্য রকম,—তাঁরা কাছের জিনিস দেখতে পান, দূরের জিনিস দেখতে কষ্ট হয়। তাঁদের দরকার পেট-সরু লেন্সের চশমা, মাইনাস পাওয়ারের। পেট-সরু লেন্সকে বলে কনকেভ লেন্স (concave lens)। কনকেভ লেন্স আলো জড়ো করে না, ছড়িয়ে দেয়। এই রকম একটা চশমা রোদে ধরো। কোনো রকম তেজী আলোর বিন্দু কাগজের ওপর তো পড়বেই না, বরং দেখবে রোদের আলো গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে লেন্সের মধ্য দিয়ে।

তাহলে লেন্স দুই জাতের: কনভেক্স ও কনকেভ। কিন্তু এরাও নানা ধরনের হতে পারে। ২ নং ছবিতে দেখো।



2 নং চিত্র : নানা ধরনের কনভেক্স ও কনকেভ লেন্স

সমান্তরাল আলো কনভেক্স লেন্সের মধ্য দিয়ে ঘনীভূত হচ্ছে F বিন্দুতে। F বিন্দুকে বলে ফোকাস (focus)। লেন্স থেকে ফোকাসের দূরত্ব Fকে বলে ফোকাল লেংথ (focal length) — ছবিতে f দিয়ে দেখান হয়েছে।

কনভেক্স লেন্স আলো ঘনীভূত বা জড়ো করে।

সমান্তরাল আলো কনকেভ লেন্সের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন F বিন্দু থেকে আসছে। F বিন্দুকে বলে ফোকাস। লেন্স থেকে ফোকাসের দূরত্বকে বলে ফোকাল লেংথ। ছবিতে f দিয়ে দেখান হয়েছে।

কনকেভ লেন্স আলো ছড়িয়ে দেয়।

॥ দুই ॥

চোখ

আলোকবিজ্ঞান বা বীক্ষণ-বিজ্ঞানের কথা বলতে গেলে চোখের কথা আগে বলতে হয়। আমরা কী করে দেখতে পাই, চোখের ভেতর কী আছে, চোখ খারাপ হলে চশমা দিয়ে দৃষ্টি সংশোধন হয় কী করে, সে কথাই এখানে বলবো।

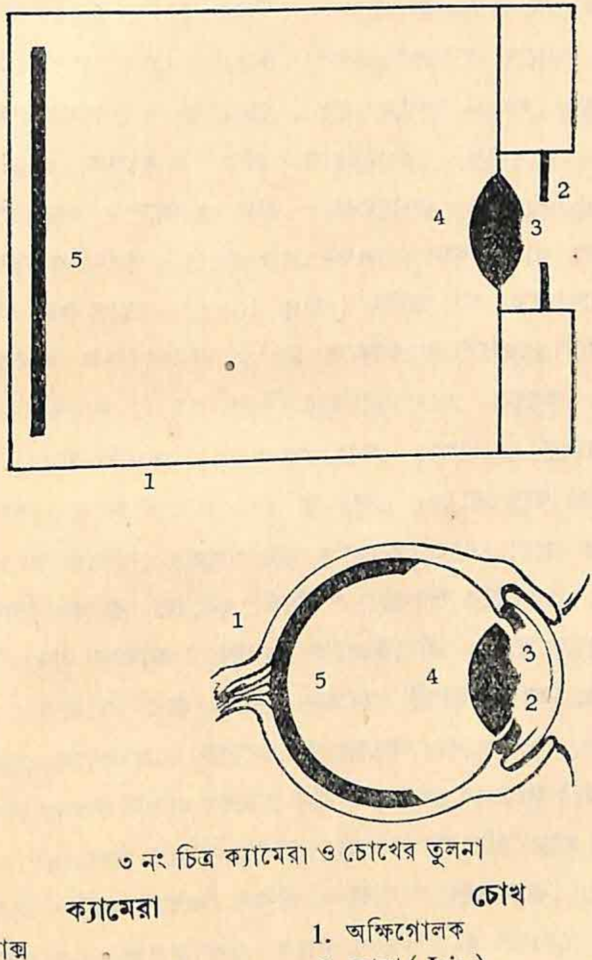
আলো না হলে আমরা দেখতে পাই না। দেখতে হলে আলো চাই। কোথায় আলো চাই? যে জিনিসটা দেখবো, সেটার ওপর আলো পড়া চাই। শুধু চোখের ওপর আলো পড়লে লাভ নেই। মনে করো, অন্ধকার ঘরে টর্চলাইট নিয়ে ঢুকেছো, টেবিল থেকে বই নিতে হবে। টর্চের আলো কি চোখে ফেলবে? কখনোই না। ফেলবে টেবিলের ওপর। বইটার ওপর যখন আলো পড়বে তখনই দেখতে পাবে। বইএর ওপর আলো পড়লে সেখান থেকে আলো ঠিকরে এসে চোখে ঢুকবে, চোখের মধ্যে বইটার প্রতিচ্ছবি পড়বে, তাতেই দেখতে পাবে।

আমাদের চোখ একটা বীক্ষণ-যন্ত্রবিশেষ। অনেকটা ক্যামেরার মতো। অথবা বলতে পারো, ক্যামেরা অনেকটা আমাদের চোখের মতো। চোখ আর ক্যামেরার বিভিন্ন

অংশ যদি মিলিয়ে মিলিয়ে তুলনা করো তো অনেক সাদৃশ্য দেখতে পাবে।

অক্ষিগোলক (eye ball) একটা সাদা বড়ো মার্বেলের মতো। চোখকে ধুলো-বালি বা খুব তেজী আলোর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আছে চোখের পাতা (eye-lid)। অক্ষিগোলকের সাদা অংশকে বলে শ্বেতমণ্ডল। এর সামনের দিকে চোখের তারা (iris), প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যাসের কালো চাক্তির মতো। চোখের তারার মধ্যে সর্ষের মতো কালো একটা বিন্দু। একে বলে তারারন্ধ্র (pupil), সাধারণ কথায়, মণি। তারারন্ধ্র মানে চোখের তারার মধ্যের ছিদ্র বা ফুটো। এই ছিদ্র দিয়ে আলো চোখের মধ্যে ঢুকতে পারে। এর পিছনেই প্রকৃতির গড়া একটা কনভেক্স লেন্স। লেন্সটা অবশ্যই কাঁচের তৈরি নয়, নরম স্বচ্ছ জেলির মতো জিনিস দিয়ে তৈরি। লেন্সটা ধরা আছে পেশীর আংটির (muscular ring) মধ্যে। বাইরের সব জিনিসের ছবি এই লেন্সের সাহায্যে সৃষ্টি হয়ে অক্ষিপটের (retina) ওপর পড়ে। অক্ষিপট হাজারটা শিরা-উপশিরা দিয়ে তৈরি, এদের বলে দৃষ্টিস্নায়ু (optic nerves)। চোখের লেন্স দিয়ে ছবি ফোকাস হয়ে অক্ষিপটে পড়লেই দৃষ্টিস্নায়ুগুলি আমাদের মস্তিষ্কে (brain) খবর পাঠায়, তাতেই আমরা দেখতে পাই।

এবার চোখকে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করা যাক। অক্ষিগোলককে ক্যামেরার বাক্সের সঙ্গে তুলনা করা যায়।



৩ নং চিত্র ক্যামেরা ও চোখের তুলনা

ক্যামেরা

1. বাক্স
2. স্টপ বা Iris Diaphragm
3. আলো যাবার ছিদ্র
4. লেন্স
5. আলোকগ্রাহী ফিল্ম বা প্লেট

চোখ

1. অক্ষিগোলক
2. তারা (Iris)
3. আলো যাবার ছিদ্র : তারা যন্ত্র
4. লেন্স
5. আলোকগ্রাহী অক্ষিপট : retina

দুটোই সব-দিক-বন্ধ আলো ধরবার কুঠরি, শুধু সামনের দিকে আলো ঢুকবার একটা ছিদ্র। এর পিছনেই একটা কনভেক্স লেন্স,—ক্যামেরাতেও, চোখেও। চোখের তারার মধ্যে তারারন্ধ্র, ক্যামেরায় স্টপ ডায়াফ্রাম (stop diaphragm)। ক্যামেরায় স্টপ ডায়াফ্রাম হলো ছিদ্র-ওয়ালা ধাতুর পাত। যখন বেশি আলো, তখন ক্যামেরার ডায়াফ্রামকে 'স্টপ ডাউন' (stop down) করতে হয়, অর্থাৎ ফুটোটা ছোটো করে নিতে হয়। আবার কম আলোতে ছবি তুলতে হলে বাড়িয়ে নিতে হয়। চোখের মণিও (তারারন্ধ্র) আলোর জোর অনুসারে ছোটো-বড়ো হয়। পরীক্ষা করে দেখো। তোমার ছোটো ভাই বা বোনকে ঘরের মধ্যে এনে যে দিকে কম আলো সেদিকে তাকাতে বলো। দেখবে ওর চেখের মণিটা (মধ্যের কালো বিন্দুটা) বড়ো হয়েছে। এবার ওকে বারান্দার আলার মধ্যে নিয়ে এসো, দেখবে মণিটা কতো ছোটো হয়ে গিয়েছে। এর কারণ, ঘরের মধ্যে আলো কম, চোখ চায় বেশি আলো, দেখবার সুবিধার জন্যে। অমনি চোখের মণিটা আপনা থেকেই বড়ো হয়ে বেশি আলো চোখে ঢুকতে দিলো। কিন্তু যেই তাকে বাইরে নিয়ে এলে আলোর তেজের মধ্যে, অমনি তারারন্ধ্র (মণি) ছোটো হয়ে গেলো, যাতে বেশি আলো ঢুকে চোখকে না ধাঁধিয়ে দেয়। চোখের তারাকে বলে iris, এর মধ্যে আলো যাবার ছিদ্র। এ থেকেই ক্যামেরার আলো-নিয়ন্ত্রণ করবার পর্দাকে iris diaphragm নাম দেওয়া হ'য়েছে।

ক্যামেরার লেন্স দিয়ে যেমন ফিল্ম-এর ওপর ছবি পড়ে, চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে তেমনি অক্ষিপটের (retina) ওপর ছবি পড়ে। ফিল্মটায় আলো লেগে ছবির ছাপ তোলে। ফিল্মটা আলোকগ্রাহী (light sensitive), অক্ষিপটও আলোকগ্রাহী। তফাত এই যে ফিল্মএর ছবি ফুটিয়ে তুলতে ডেভালাপ করতে হয়, অক্ষিপটের ছবি তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে ফুটে ওঠে, তাতেই দেখতে পাই।

বলবে, কাছে-দূরে জিনিস থাকলে ক্যামেরার লেন্স ফোকাস করতে হয়। চোখে কি তা করতে হয় না? চোখেরও ফোকাস বদলাতে হয় দূরত্ব অনুসারে। ক্যামেরার ফোকাস বদলানো হয় ফিল্ম থেকে লেন্সকে কাছে-দূরে করে, চোখের বেলায় চোখের লেন্সের ফোকাল লেংথ বদলে। যে পেশীর আংটির মধ্যে চোখের লেন্সটা বসানো সেটাই এই ফোকাসের কাজ করে। বলেছি চোখের লেন্সটা নরম জিনিস দিয়ে তৈরি, তাই ঐ পেশীর চাপে বা টানে কনভেক্স লেন্সটা বেশি-ডোঙা বা কম-ডোঙা হতে পারে। এইভাবে ফোকাল লেংথ বদলায়, তার ফলে কাছে-দূরের জিনিস অক্ষিপটে স্পষ্ট ফোকাস হয়ে পড়ে। এর জন্য ভাবতে হয় না, হিসাব করতে হয় না। যেমন প্রয়োজন, চোখের পেশী আপনা থেকেই তক্ষুণি লেন্স-টাকে ফোকাস করে দেয়।

চোখ খারাপ কী করে হয়? চশমা দিয়ে কী করে দৃষ্টি শোধরানো যায়?

চোখ খারাপ নানা ধরনের হতে পারে। লং-সাইটেড

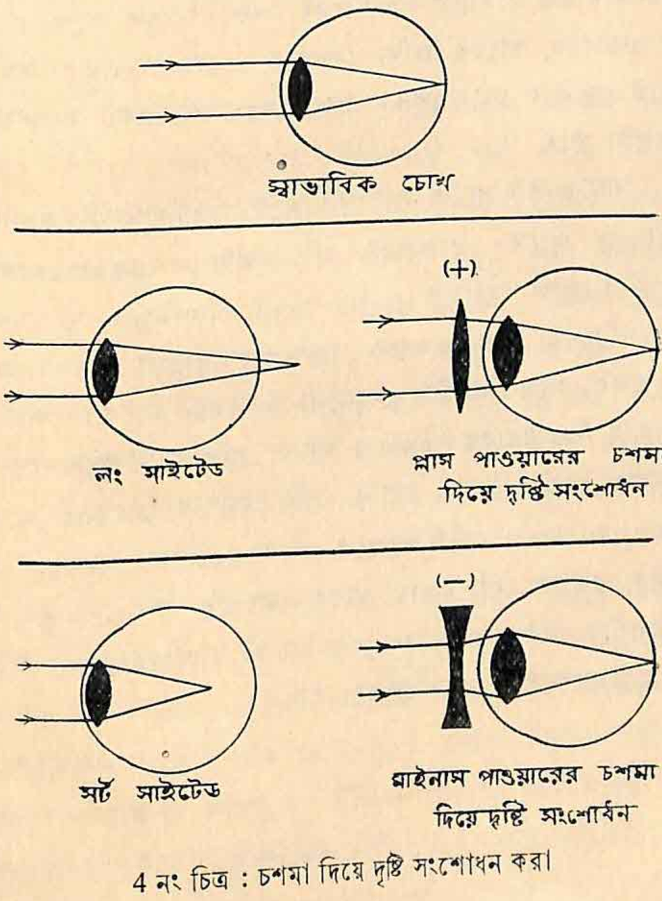
(long sighted), ও শর্ট-সাইটেড (short sighted)— এই দুরকম চোখের দোষই সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়। লং-সাইটেড হলে প্লাস পাওয়ারের ও শর্ট-সাইটেড হলে মাইনাস পাওয়ারের চশমা লাগে। তা ছাড়া কেউ কেউ বাই-ফোকাল (bi-focal) চশমা পরেন। বাই-ফোকাল চশমায় মাইনাস ও প্লাস পাওয়ার ওপর-নিচে থাকে। আর, সব রকম চোখের দোষের সঙ্গে এস্‌টিগ্‌ম্যাটিজম্‌ (astigmatism) দোষ থাকতে পারে। এ সবের মানে কী তা বলছি।

সাধারণত বেশি বয়েসের লোকদের লং-সাইটেড দৃষ্টি হয়। তাঁরা দূরের জিনিস দেখতে পান, কিন্তু কাছের জিনিস ঝাপসা দেখেন, বই পড়তে চশমা দরকার হয়। এরকম হলে প্লাস পাওয়ারের চশমা লাগবে, তার মানে কনভেক্স লেন্সের চশমা। লং-সাইটেড হলে চোখের মধ্যের লেন্সটার ফোকাল লেংথ অক্ষি গোলকের তুলনায় বড়ো থাকে, ছবি ফোকাস হবার আগেই অক্ষিপটের ওপর ছবি পড়ে, তাতেই ছবি (অর্থাৎ দৃষ্টি) ঝাপসা হয়। কনভেক্স লেন্সের চশমা দিলে, চশমা আর চোখের লেন্স মিলে প্রতিচ্ছবিটা অক্ষিপটের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফোকাস পড়ে। 4 নং ছবিতে দেখো।

শর্ট-সাইটেড চোখে এর উল্টো ব্যাপার হয়। চোখের মধ্যের লেন্স দিয়ে যে ছবি সৃষ্টি হয় সেটা পড়ে অক্ষিপটের আগেই। অর্থাৎ লেন্সটার ফোকাল লেংথ অক্ষিগোলকের তুলনায় ছোটো। সে জন্য অক্ষিপটে ঝাপসা ছবি পড়ে। এ

অবস্থায় কনকেভ লেন্সের চশমা (মাইনাস পাওয়ারের) দিলে, চশমা আর চোখের লেন্স মিলে প্রতিচ্ছবিটা অক্ষিপটের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফোকাস ফেলতে পারে।

আবার অনেকে দূরের জিনিস ঝাপসা, কাছের জিনিসও



4 নং চিত্র : চশমা দিয়ে দৃষ্টি সংশোধন করা

ঝাপসা দেখেন, মাঝামাঝি জিনিস স্পষ্ট দেখতে পান। এর কারণ, চোখের যে পেশী লেন্সটাকে কাছে-দূরে ফোকাস করতে সাহায্য করে সেটা কাজ করতে পারছে না। তখন লাগবে বাইফোকাল চশমা। ওপরে থাকবে দূরের জিনিস দেখবার জন্য মাইনাস পাওয়ারের লেন্স, নিচের অংশ প্লাস পাওয়ারের, কাছের জিনিস দেখবার (বই পড়বার) জন্য। বাই-ফোকাল মানে দুরকম ফোকাসের লেন্স, একটা মাইনাস, অন্যটা প্লাস।

শর্ট সাইট বা লং-সাইটের সঙ্গে এস্‌টিগ্‌ম্যাটিজম্ দোষ থাকতে পারে। ব্যাপারটা কী, বলছি। চোখের লেন্সের দু পিঠ গোল ডৌলের (spherical curvature), যেমন ম্যাগনিফাইং লেন্স-এ থাকে। কিন্তু চোখ খারাপ হলে চোখের লেন্সের গোল পিঠ ঠিক গোল না-ও থাকতে পারে। কোনো একটা দিক বরাবর (axis) কম বা বেশি গোল হতে পারে। অর্থাৎ সেই দিকে একটা রুটি বেলবার বেলনের মতো (cylindrical) ডৌল থাকতে পারে। চোখের লেন্সের যে দিক বরাবর এই দোষ থাকে, চশমায় সেই দিক বরাবর বিপরীত বেলন-ডৌল (cylindrical curvature) দিয়ে দৃষ্টিদোষকে পূরণ করে নেওয়া হয়।

॥ তিন ॥

লেন্স তৈরির হিসেব

আমরাও লেন্স তৈরি করতে পারি। তৈরি করা মোটেই শক্ত নয়। ভাবছো, কাচ গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে লেন্স তৈরি হয়? তা নয়। কাচের পিঠ ঘষে ক্ষইয়ে যেমন দরকার তেমন ডৌল (curvature) বা ডোঙা-ভাব দেওয়া হয়। ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে কিছু দেখা যায় না, সে জন্য তাকে পালিশ করে স্বচ্ছ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। কী দিয়ে ঘষতে হয়, কী ভাবে ঘষতে হয়, কী দিয়ে পালিশ করতে হয়, এ সব কথা পরে বলবো। হাতের কাজ আয়ত্ত করতে সময় লাগবে না। তার আগে জানতে হবে কীসের উপযোগী কোন ধরনের লেন্স কী ভাবে হিসাব করতে হয়।

মনে করো, কেউ বললো প্লাস দুই পাওয়ারের চশমার লেন্স তৈরি করে দাও। কী ভাবে হিসাব করবে? এর উত্তর হবে: প্লাস পাওয়ার মানে কনভেক্স লেন্স; দুই পাওয়ার মানে ফোকাল লেংথ আধ মিটার (1 মিটার = 100 সেন্টি-মিটার = প্রায় 40 ইঞ্চি; 1 ইঞ্চি = প্রায় $2\frac{1}{2}$ সেন্টিমিটার)। যে চশমার ফোকাল লেংথ এক মিটার (বা একশ সেন্টিমিটার), তার শক্তি বা পাওয়ার (power) হবে এক। ফোকাল

লেংথ আধ মিটার বা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার হলে চশমার শক্তি হবে দুই। ফোকাল লেংথ সিকি মিটার বা পঁচিশ সেন্টি-মিটার হলে চশমার শক্তি হবে চার। অর্থাৎ

$$\text{চশমার শক্তি} = \frac{1}{\text{ফোকাল লেংথ (মিটারে)}}$$

মনে করো, একটা চশমার ফোকাল লেংথ 40 সেন্টিমিটার। তাহলে সে চশমার শক্তি বা পাওয়ার কতো ? চল্লিশ সেন্টি-মিটার মানে $40 \div 100$ মিটার বা $^2/_5$ মিটার। তাহলে চশমার পাওয়ার হলো $1 \div {}^2/_5 = {}^5/_2 = 2\frac{1}{2}$ বা 2·5 (আড়াই)। বলা উচিত আড়াই ডাইঅপটার (Diopter)। চশমার শক্তিকে ডাইঅপটার দিয়ে বলে। তবে ডাইঅপটার কথাটার খুব চল নেই, সাধারণত শুধু সংখ্যাটাই বলে।

চশমার শক্তি যে ভাবে হিসাব হলো, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের শক্তি (magnifying power বা পরিবর্ধন শক্তি) সে ভাবে হিসাব হয় না। ছোটো ফোকাল লেংথ-এর কনভেক্স লেন্সই হলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস। যে কনভেক্স লেন্সের ফোকাল লেংথ এক ইঞ্চি তার ম্যাগনিফাইং পাওয়ার বা পরিবর্ধনশক্তি দশ। এ ক্ষেত্রেও ফোকাল লেংথ যতো কমবে শক্তিও সেই অনুপাতে বাড়বে। ফোকাল লেংথ আধ ইঞ্চি হলে পরিবর্ধন শক্তি হবে কুড়ি। অর্থাৎ ম্যাগনিফাইং লেন্সের

$$\text{পরিবর্ধন শক্তি} = \frac{10}{\text{ফোকাল লেংথ (ইঞ্চিতে)}}$$

মনে করো একটা কনভেক্স লেন্সের ফোকাল লেংথ 2 ইঞ্চি। তার ম্যাগনিফাইং পাওয়ার হবে $^{10}/_2 = 5$ (পাঁচ)। তেমনি

ফোকাল লেংথ যদি সওয়া এক ইঞ্চি হয় তাহলে ম্যাগনিফাইং পাওয়ার হবে $10 \div 1\frac{1}{4} = 8$ (আট)। অর্থাৎ ক্ষুদে জিনিস আটগুণ বড়ো হয়ে দেখাবে। লেন্স-এর ম্যাগনিফাইং পাওয়ারকে এই জন্য গুণচিহ্ন দিয়ে লেখা হয়, যেমন 5×, 8×, 10× ইত্যাদি।

দেখছো, লেন্সের ফোকাল লেংথ ব্যাপারটাই হলো আসল। চশমার পাওয়ার বা ম্যাগনিফাইং পাওয়ার, যা-ই বলো সবই ফোকাল লেংথ অনুসারে হিসাব করতে হবে।

লেন্সের ফোকাল লেংথ নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপর। প্রথমত, যে কাচের লেন্স সেই কাচের আলো বাঁকানোর ক্ষমতার ওপর; দ্বিতীয়ত, লেন্সের পিঠের ডৌল বা ডোঙা-ভাবের (curvature) ওপর। এ দুটোরই মাপ আছে। না হলে ফোকাল লেংথ-এর মাপ কী করে হিসাব করা যাবে?

কাচের আলো বাঁকানোর (refraction) ক্ষমতাকে প্রতিসরাঙ্ক বা refractive index দিয়ে মাপা হয়। সাধারণত কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5 থেকে 1·6 এর মধ্যে থাকে। প্রতি-সরাঙ্কের সংখ্যা কী করে মাপা যায় সে কথা বইয়ের শেষে পরিশিষ্টতে বলেছি। সাধারণ কাচের (যেমন, জানলার কাচ, আয়নার কাচ ইত্যাদি) প্রতিসরাঙ্ক থাকে 1·5 এর মতো। এগুলি ক্রাউন কাচ (crown glass) জাতের। ভারী জাতের কাচের (যেমন কাট গ্লাস, লেড গ্লাস ইত্যাদি) প্রতি-সরাঙ্ক হয় 1·6 মতো। এগুলি ফ্লিন্ট (flint glass) কাচ জাতের। তাহলে ক্রাউন জাতের কাচের আলো বাকানোর

ক্ষমতা কম, ফ্লিণ্ট জাতের কাচের বেশি। কারণ ক্রাউনের প্রতি-সরাঙ্ক কম, ফ্লিটএর প্রতিসরাঙ্ক বেশি। তবে বেশির ভাগ লেন্সই ক্রাউন জাতের কাচ দিয়ে তৈরি হয়।

লেন্সের পিঠের ডৌল (carvature) বা ডোঙা-ভাব মাপা হয় গোল-পিঠের ব্যাসার্ধ (radius of curvature) দিয়ে। লেন্সের গোল পিঠ যেন একটা বড়ো বল-এর ছোটো অংশ। বল-এর একটা ব্যাস (diameter) আছে, বা ব্যাসার্ধ (radius) আছে। বলটা কতো বড়ো বা কতো ছোটো তা মাপা যাবে সেই ডৌল-গোলের ব্যাসার্ধ দিয়ে। ব্যাসার্ধ যতো ছোটো হবে, ডৌল বা ডোঙা-ভাব ততো বেশি হবে, ফোকাল লেংথ ততো ছোটো হবে ও লেন্সের শক্তি বেশি হবে।

লেন্সের দুপিঠের ডৌল সমান হতে পারে, সমান না-ও হতে পারে। এমনকি লেন্সের শুধু এক দিকটায় ডৌল দেওয়া যেতে পারে, অন্য পিঠটা সমান বা প্লেন থাকতে পারে : এ জাতীয় লেন্সকে বলে প্লেনোকনভেক্স বা প্লেনে-কনকেভ, এ-কথা আগেই বলেছি।

এখন বুঝতে পারছো, লেন্সের ফোকাল লেংথ (f) হিসাব করতে হলে জানতে হবে কাচের প্রতিসরাঙ্ক বা রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স (m), ও দুপিঠের ডৌলের ব্যাসার্ধ। ধরো এক পিঠের ডৌলের ব্যাসার্ধ r_1 অন্য পিঠের ডৌলের ব্যাসার্ধ r_2। ফোকাল লেংথ-এর সাধারণ ফরমুলা হচ্ছে :

$$\frac{1}{f} = (m-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

ডবল কনভেক্স বা ডবল কনকেভ লেন্স হলে এই ফরমুলা হয়ে দাঁড়াবে :

$$\frac{1}{f}=(m-1)\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right)$$

মনে করো একটা লেন্স তৈরি হচ্ছে ক্রাউন কাচ দিয়ে, যার $m=1{\cdot}5$, এক পিঠের ডৌল-ব্যাসার্ধ 5 ইঞ্চি, অন্য পিঠের 10 ইঞ্চি। তাহলে এই ডবল কনকেভ বা ডবল কনভেক্স লেন্সের ফোকাল লেংথ কী দাঁড়াবে ? ফরমুলা অনুসারে হবে

$$\frac{1}{f}=(1{\cdot}5-1)\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{10}\right)$$

$$=0{\cdot}5\times\frac{3}{10}=\frac{5}{10}\times\frac{3}{10}=\frac{15}{100}$$

যদি $\frac{1}{f}=\frac{15}{100}$ হয়, তাহলে $f=\frac{100}{15}=6\frac{2}{3}$ ইঞ্চি।

এইভাবে ফোকাল লেংথ হিসাব করা গেলো।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ঐ লেন্সের দুপিঠেই যদি 10 ইঞ্চি ব্যাসার্ধের, সমান ডৌল দেওয়া হতো তাহলে ফোকাল লেংথ কতো হতো ? একই কাচ, অর্থাৎ $m=1{\cdot}5$, আর $r_1=r_2=10$ ইঞ্চি।

তাহলে

$$\frac{1}{f}=(1{\cdot}5-1)\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{10}\right)$$

$$=0{\cdot}5\times\frac{2}{10}=\frac{5}{10}\times\frac{2}{10}=\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$$

অর্থাৎ দাঁড়ালো

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{10},$$

অতএব $f=10$ ইঞ্চি।

একটা মজা লক্ষ্য করো। প্রতিসরাঙ্ক যদি 1·5 হয়, আর লেন্সের দুপিঠের ডৌল যদি সমান হয়, তাহলে ফোকাল লেংথ হবে ডৌল-ব্যাসার্ধের সমান। এই সূত্র দিয়ে হিসেব করা কতো সহজ!

লেন্স তৈরি করবার সময় এই সূত্রটা আমাদের খুব কাজে লাগবে। কারণ, আমরা সাধারণ কাচ দিয়ে তৈরি করবো, যার প্রতি সরাঙ্ক 1·5 মতোই হবে।

নানা কাজের জন্য আমরা প্লেনো-কনভেক্স বা প্লেনো কনকেভ লেন্স তৈরি করব। এর হিসাব আরও সোজা। প্লেনো-জাতের লেন্সের এক পিঠ সমান বা প্লেন, অন্যদিকে ডৌল। অতএব একটা ডৌল-পিঠের একটা ব্যাসার্ধ ধরলেই হলো। তাহলে প্লেনো-জাতের লেন্সের ফোকাল ফরমুলা হবে

$$\frac{1}{f}=(m-1)\ \frac{1}{r}$$

মনে করো ক্রাউন কাচ দিয়ে প্লেনো কনভেক্স বা প্লেনো কনকেভ লেন্স তৈরি হচ্ছে। ক্রাউন কাচের $m=1·5$, যেমন আগে ধরেছো। আর মনে করো ডৌল পিঠের ব্যাসার্ধ $r=10$ ইঞ্চি। এমন লেন্সের ফোকাল লেংথ কতো দাঁড়াবে? ওপরের ফরমুলা অনুসারে

$$\frac{1}{f}=(1{\cdot}5-1)\times\frac{1}{10}=0{\cdot}5\times\frac{1}{10}=\frac{5}{10}\times\frac{1}{10}=\frac{1}{20}$$

অর্থাৎ $f=20$ ইঞ্চি। তেমনি, ক্রাউন কাচে $(m=1{\cdot}5)$ প্লেনো কনভেক্স বা প্লেনো কনকেভ তৈরি করতে গিয়ে যদি ডৌল পিঠের ব্যাসার্ধ 15 ইঞ্চি দাও তো ফরমুলা কষে দেখবে ফোকাল লেংথ 30 ইঞ্চি হচ্ছে। আবার একটা সহজ সূত্র পাওয়া গেলো। যে কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5 সেই কাচের প্লেনো-জাতের লেন্সের ফোকাল লেংথ হবে ডৌল-ব্যাসার্থের দ্বিগুন; অতএব যে ফোকাল লেংথ দরকার, ডৌল-ব্যাসার্ধ দিতে হবে তার অর্ধেক।

এই দুটি সহজ নিয়ন ফ্লিণ্ট কাচের বেলা খাটবে না, সে কথা যেন খেয়াল থাকে। এবার দেখা যাক সমান ডৌলের দুটো লেন্স, একটা ক্রাউন কাচের অন্যটা ফ্লিণ্ট কাচের হলে ফোকাল লেংথ কতো তফাত হয়। ধরো, একটা প্লেনো কনভেক্স লেন্স তৈরি হচ্ছে, গোল পিঠের ডৌল হবে 10 ইঞ্চি ব্যাসার্ধের, অর্থাৎ $r=10$ ইঞ্চি। ক্রাউন কাচ $(m=1{\cdot}5)$ দিয়ে তৈরি হলে

$$\frac{1}{f}=(1{\cdot}5-1)\times\frac{1}{10}=\frac{1}{20},\ \text{অর্থাৎ},\ f=20\ \text{ইঞ্চি।}$$

ফ্লিণ্ট কাচ $(m=1{\cdot}6)$ দিয়ে তৈরী হলে

$$\frac{1}{f}=(1{\cdot}6-1)\times\frac{1}{10}=\frac{6}{10}\times\frac{1}{10}=\frac{6}{100}$$

$$\text{অর্থাৎ},\ f=\frac{100}{6}=16\frac{2}{3}\ \text{ইঞ্চি।}$$

তাহলে দেখছো, কাচের জাত তফাত হওয়াতে একটায় ফোকাল লেংথ হলো 20 ইঞ্চি, অন্যটায় হলো $16\frac{2}{3}$ ইঞ্চি। ফ্লিন্ট কাচের আলো বাঁকানোর ক্ষমতা বেশি, তাই ফোকাল লেংথ ছোটো হলো, লেন্সের পাওয়ার বেশি হলো।

সব রকম লেন্সের কথা বললাম। কিন্তু মেনিস্কাস্ লেন্সের কথা এখনও কিছু বলিনি। পারতপক্ষে আমরা মেনিস্কাস্ লেন্স তৈরি করব না। করতে হলে হিসেবে বিশেষ কিছু হাঙ্গামা নেই। মেনিস্কাস্ লেন্স হলে সাধারণ ফরমুলার বিয়োগ-চিহ্ন, অর্থাৎ $\frac{1}{r_1} - \frac{2}{r_2}$, বজায় থাকবে, —সেটা যোগ চিহ্নে পরিণত হবে না। মনে করো একটা মেনিস্কাস্ লেন্সের চশমা হচ্ছে, ক্রাউন কাচের $(\mu = 1{\cdot}5)$; এক পিঠের ডৌল সাড়ে সাত $(7{\cdot}5)$ ইঞ্চি, অন্য পিঠের 33 ইঞ্চি ব্যাসার্ধের। অর্থাৎ, $r_1 = 7{\cdot}5$, $r_2 = 33$ ইঞ্চি। তাহলে ফোকাল লেংথ দাঁড়াবে এইভাবে :

$$\frac{1}{f} = (1{\cdot}5 - 1)\left(\frac{1}{7{\cdot}5} - \frac{1}{33}\right) = 0{\cdot}5(0{\cdot}13 - 0{\cdot}03) = 0{\cdot}5 \times 0{\cdot}1$$

$$\frac{5}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{5}{100}$$

অর্থাৎ, $f = \frac{100}{5} = 20$ ইঞ্চি।

॥ চার ॥

লেন্স তৈরীর কারিগরী

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, কী ধরণের কাচ দিয়ে লেন্স তৈরি হ'বে? সাধারণ কাচ দিয়েই লেন্স তৈরি করা যাবে। সাধারণ কাচ মানে কী? তাছাড়াও আর কী রকম কাচ হয়? সাধারণ কাচ আনে সীট গ্লাস (sheet glass) বা প্লেট গ্লাস (plate glass)। এই জাতের কাচ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সাধারণ কাচ পেতে পারো ভাঙা সার্সি থেকে। বাজারে নানা রকমের মোটা ও পাতলা কাচের চাদর কিনতে পাওয়া যায়। প্রায় $\frac{1}{16}$ ইঞ্চি থেকে আরম্ভ করে এক বা দেড় ইঞ্চি পুরু কাচের চাদর পাওয়া যায়। কলকাতায় রাধাবাজার, সোয়ালো লেন, ক্যানিং ষ্ট্রীট এসব যায়গায় অনেক কাচের দোকান আছে।

এই সব কাচের একটা টুকরো নিয়ে কিনার থেকে দেখলে সবুজ রঙ দেখতে পাবে। অর্থাৎ কাচটা একেবারে রঙহীন স্বচ্ছ নয়। তবে এই সবুজ রঙ এত অল্প যে তা'তে বিশেষ কোন ক্ষতি করবে না। ভালো জাতের প্লেটগ্লাসে রঙ আরো অল্প দেখবে। বেছে কিনবে। আর একটা কথা, খুব ভালো করে নজর করলে কোন কোন কাচের মধ্যে

বাতাসের বুদ্বুদ (air-bubbles) দেখতে পাবে। এরকম বুদ্বুদ থাকা লেন্স তৈরির পক্ষে মোটেই ভালো না। আবার কোনো কোনো কাচের মধ্যে শিরার মতো দাগ (veins) দেখতে পাবে, সেটাও লেন্সের পক্ষে খারাপ। তাহলে সাধারণ কাচ দিয়ে লেন্স তৈরি করতে হলে কাচ দেখে শুনে বেছে কিনতে হবে, যেন সবুজ রঙ কম থাকে, আর বুদ্বুদ বা শিরার দাগ না থাকে।

এটা সাধারণ কাচের কথা বললাম। লেন্স বানাবার জন্য যে কাচ তৈরি হয় তাকে বলে বীক্ষণ কাচ বা optical glass। বীক্ষণ কাচ খুব পরিষ্কার খাঁটি মালমশলা দিয়ে তৈরি হয়। বীক্ষণকাচ একেবারে বর্ণহীন স্বচ্ছ হয়, মধ্যে কোন বুদ্বুদ বা শিরার দাগ থাকে না। এই হলো সাধারণ কাচ আর বীক্ষণ কাচের মধ্যে মোটামুটি তফাত।

আমরা তাহলে সাধারণ কাচ দিয়েই লেন্স তৈরি করব। আমাদের দেশে বীক্ষণ কাচ তৈরি হয় না। বিলেত, আমেরিকা ও জার্মানিতে ভালো বীক্ষণকাচ তৈরি হয়। দরকার হলে বীক্ষণকাচ আনিয়ে নেওয়া যায়। আপাততঃ আমরা সাধারণ কাচ দিয়েই লেন্স তৈরি করতে শিখব এবং এই লেন্স দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব।

লেন্স তৈরির ধাপগুলি হলো :—

প্রথম ধাপ—যতো বড়ো লেন্স হবে, সেই অনুসারে কাচের চাদর থেকে একটা চারকোনা টুকরো কেটে নাও। একটু বড়ো রেখো। তারপর চারটে কোনা থেকে একটু

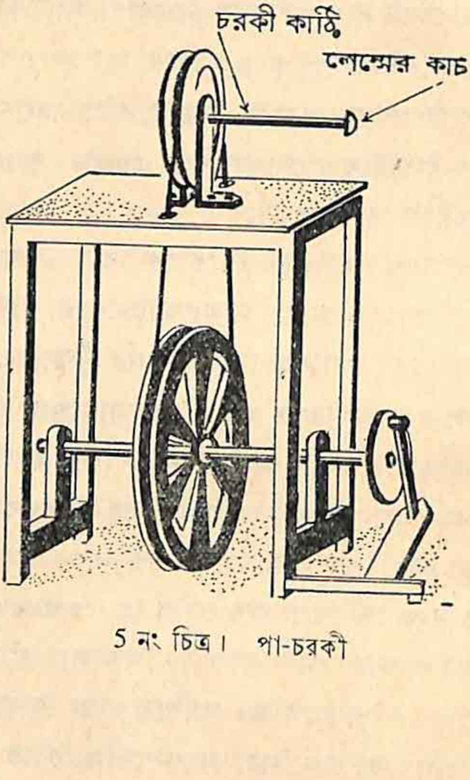
একটু করে কেটে দাও। তাহলে টুকরোটা আটকোনা হলো। হীরের কলম (diamond pen) দিয়ে কাচের ওপর আঁচড় কেটে চাপ দিলেই দাগবরাবর ভাঙবে, এইভাবেই কাচ কাটা হয়। ছবি-বাঁধাইয়ের দোকানদার এরকম কাচ কাটবার কলম হামেশাই ব্যবহার করে।

লেন্স তৈরির কাচের টুকরোকে বলে লেন্সের ব্ল্যাঙ্ক (blank)। তাহলে প্রথমে হলো আট-কোনা ব্ল্যাঙ্ক।

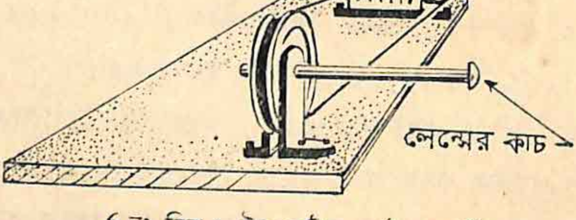
দ্বিতীয় ধাপ—আট কোনা কাচের টুক্‌রোকে চাক্তির মতো গোল ব্ল্যাঙ্কে পরিণত করা। কার্বোরাণ্ডাম (carborundum) গুঁড়ো দিয়ে ঘষে আটকোনা কাচকে গোল চাক্তিতে পরিণত করা যাবে। পরে ভালো করে বুঝিয়ে বলছি।

তৃতীয় ধাপ—গোল চক্তি কাচের এক পিঠ বা দুপিঠ কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো দিয়ে ঘষে ডৌল (curvature) দেওয়া। যেমন ডৌল দরকার সেই মাপের পিতলের ছাঁচের ওপর কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়া আর জল মাখিয়ে ঘুরন্ত কাচের চাক্তির পিঠে ধরলেই কাচের পিঠ ক্ষয়ে ডৌল নেবে। কাচের গোল ব্ল্যাঙ্ক একটা ঘুরন্ত চরকি কাঠির (spindle) মুখে লাগাতে হবে। প্রথমে মোটা দানার কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো ব্যবহার করতে হয়, ক্রমশ মিহি গুঁড়ো, এবং শেষে খুব মিহি এমারি (emery) গুঁড়ো দিয়ে ঘষতে হয়।

চতুর্থ ধাপ—রুজ (rouge) দিয়ে কার্বোরাণ্ডাম-ঘষা পিঠকে পালিশ করা। ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় না। রুজ দিয়ে ঘষে পালিশ করলে কাচের স্বচ্ছতা ফিরে আসে।



5 নং চিত্র। পা-চরকী

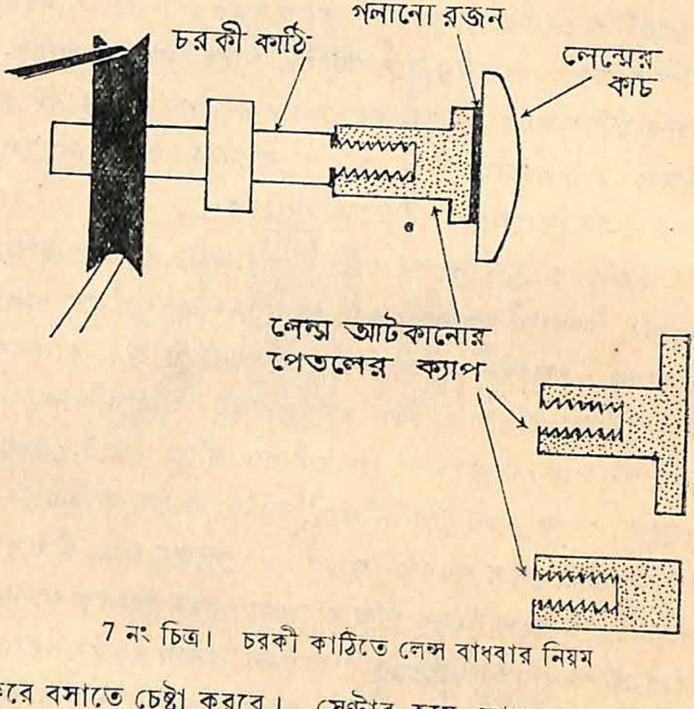


6 নং চিত্র। ইলেকট্রিক মোটর চরকী

যন্ত্র পাতির মধ্যে সবচেয়ে দরকার একটা চরকিকাঠি (spindle), যেটা খুব জোরে ঘুরবে। মিনিটে তিনশ বা চারশবার ঘোরা চাই। পা-চালানো (treadle) চরকি বা ইলেক্‌ট্রিক মোটর দেওয়া চরকি হতে পারে। 5 এবং 6 নম্বর ছবিতে দেখো। যেখানে ইলেক্‌ট্রিসিটি আছে সেখানে মোটর-চরকি সুবিধাজনক। পুরানো টেব্‌ল্ ফ্যানের মোটর দিয়ে শস্তায় লেন্স ঘষবার চরকি তৈরি ক'রে নেওয়া যায়। নাহ'লে $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{6}$ হর্সপাওয়ারের মোটর যথেষ্ট হবে।

চরকি কাঠিটা হবে $\frac{1}{4}$ বা $\frac{3}{8}$ ইঞ্চি মোটা লোহার ডাণ্ডা (rod), মাথায় থাকবে স্ক্রুর প্যাঁচ। এই প্যাঁচে নানা রকমের পেতলের ক্যাপ পরিয়ে নেওয়া যাবে। ক্যাপের মাথায় রজন গলিয়ে কাচটা চেপে ধরলেই আটকে থাকবে। ক্যাপের মুখে গোল গোল বা চৌকো খাঁজ কেটে নেওয়া ভালো, তাতে রজন ঢুকে থাকবে, কাচটা ভালো আটকাবে। চরকি কাঠি. লেন্স ধরবার ক্যাপ ও লেন্সের কাচ কীভাবে লাগানো হয়েছে 7 নম্বর ছবিতে দেখো। রজন কিনতে পাওয়া যায় বেনের দোকানে। এক পোয়া রজন কিনলে বহুদিন চলবে। এর থেকে একখণ্ড নিয়ে আস্তে আস্তে হাতুড়ী বা কাঠের টুকরোর ঘা দিয়ে গোটা গোটা টুকরো করে রেখো। এক একটা রজনের টুকরো মটরের মতো হলেই চলবে। লেন্স ধরবার ক্যাপটা স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তাতিওে নিয়ে রজনের টুকরো চেপে ধরলেই গলে লেগে যাবে। তারপর কাচের টুকরোটা চেপে ধরলেই আটকে যাবে। কাচটা মাঝামাঝি

করে অর্থাৎ 'সেণ্টার' করে লাগাবে। এক পাশে লেগেছে মনে হলে পেতলের ক্যাপটা স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তাতিয়ে নিলে রজন নরম হয়ে যাবে। তখন কাচটা আবার সেণ্টার



7 নং চিত্র। চরকী কাঠিতে লেন্স বাধবার নিয়ম

করে বসাতে চেষ্টা করবে। সেণ্টার হয়ে লাগলে পেতলের ক্যাপটা জল-ন্যাকড়া দিয়ে ঠাণ্ডা করে নেবে, রজন শক্ত হয়ে কাচটা ধরবে।

লেন্স রাখবার জন্য লাগবে কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো (carborundum powder)। কুচকুচে কালো রঙের গুঁড়ো। লোহালক্কড় ও রঙের দোকানে কিনতে পাওয়া পাওয়া যায়।

কার্বোরাণ্ডামকে এবার থেকে সংক্ষেপে কার্বো বলবো। কার্বোর মোটা ও মিহি গুড়োঁ পাওয়া যায়। এক-এক গুঁড়োয় এক-এক রকম নম্বর। কম নম্বর হলে মোটা দানা, বেশি নম্বর হলে মিহি দানা বুঝতে হবে। আমাদের এই রকম নম্বরের কার্বো লাগবে :—

মোটা—No. 60 বা 80

মাঝারি—Nos. 100, 150, 180

মিহি—No. 300 বা 2F, এবং 3F

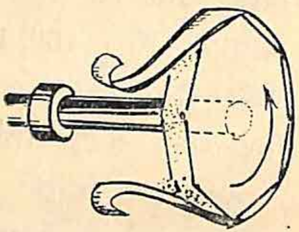
এছাড়া মিহি এমারি (emery) গুঁড়ো লাগবে। একে বলে Flour Emery। কলকাতার কোনো কোনো দোকানে বলে এমারি মাটি। যে দোকানে কার্বো গুড়োঁ পাওয়া যায় সেখানেই এমারি গুঁড়ো পাবে।

লেন্স ঘষবার পর পালিশ করবার জন্য রুজ (rouge) গুঁড়ো লাগবে। যে দোকানে কার্বোরাণ্ডাম ও এমারি পাবে সেখানেই রুজ গুঁড়ো পাবে। বিলিতি রুজ টিনে করা পাওয়া যায়, সেগুলি ভালো। আধ বা কোয়ার্টার পাউণ্ডের টিন কিনলেই যথেষ্ট।

দু-এক পাউণ্ড পিচ (Pitch) লাগবে। রাস্তায় যে পিচ দেয় সেই পিচ, তবে পরিষ্কার টুকরো কিনবে, যেন ধুলো বালি না থাকে। লোহালক্কড় ও রঙের দোকানে পিচ পাবে।

প্রথমে আট-কোনা কাচের টুকরোকে গোল করতে হবে। চরকি কাঠিতে বাঁধা কাচটা যখন ঘুরবে তখন একটা বাঁকানো টিনের পাত ওর ওপর আস্তে চেপে ধরো, আর

মোটা দানার (60 বা 80) কার্বোরাণ্ডাম ও জল দাও। ঘস্ ঘস্ করে শব্দ হবে। শব্দ কমে আসলে আবার জল ও গুঁড়ো দাও। কিছুক্ষণ বাদে দেখবে কাচের কোনাগুলি ক্ষয়ে গোল হয়ে আসছে। মোটা দানার কার্বো দিয়ে

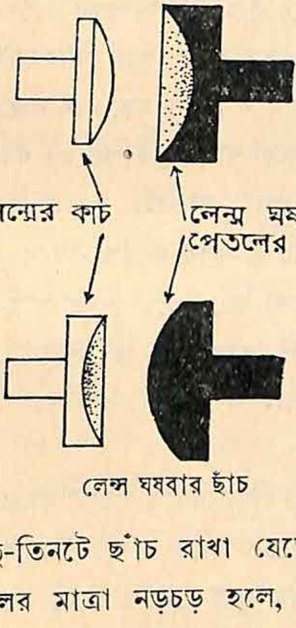


৪(৮) নং চিত্র। আট কোনা কাচকে গোল চাক্তি করা। টিনের পাতটা জল-কার্বো দিয়ে আস্তে চেপে ধরে রাখতে হবে।

ঘসলে তাড়াতাড়ি কাটবে। যখন কাটা মাপসই সম্পূর্ণ গোল চাক্তি হয়ে দাঁড়াবে তখন মাঝারি গুঁড়ো দিয়ে দু চার মিনিট চালালে চাক্তির ধারটা বেশ পরিস্কার 'ফিনিশ' পাবে।

মাপসই লেন্সের চাক্তি তৈরী হলে কাচের পিঠে ডৌল (Curvature) দিতে হবে। এটাই হোলো লেন্স-গ্রাইণ্ডিং-এর আসল কাজ। কাচের চাক্তিটা যখন চরকি কাঠিতে ঘুরবে তখন ঘষবার পেতলের ছাঁচে কার্বো গুঁড়ো জল মাখিয়ে কাচের পিঠে আস্তে আস্তে চেপে ধরতে হবে। ঘস্ ঘস্ শব্দ কমে এলেই আবার কার্বো গুঁড়ো আর জল মাখিয়ে দেবে। দেখবে কাচের পিঠ ক্ষয়ে ক্ষয়ে পেতলের

ছাঁচের ডৌল নিচ্ছে। এখানেও প্রথমে মোটা গুঁড়ো দিয়ে শুরু করতে হবে, তাতে তাড়াতাড়ি কাটবে। একে বলে রাফ্-গ্রাইণ্ডিং (rough grinding)। রাফ্-গ্রাইণ্ডিং-এর সময় পেতলের ছাঁচটা ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এজন্য



লেন্স ঘষবার ছাঁচ

একই মাপের দু-তিনটে ছাঁচ রাখা যেতে পারে। কারণ শেষকালে ডৌলের মাত্রা নড়চড় হলে, লেন্সের ফোকাল লেংথ ও পাওয়ার বদলে যাবে। পেতলে-কাটা ঘষবার ছাঁচটা রাফ্ গ্রাইণ্ডিং-এ নষ্ট করা ঠিক না, এর মেহনত ও দাম বেশি। মোটা বা রাফ্-গ্রাইণ্ডিং এর জন্যে সীসের ছাঁচ (lead tool) সহজে তৈরি করে নেওয়া যায়। মনে করো, তোমার কনকেভ ও কনভেক্স লেন্স তৈরির জন্য একজোড়া পেতলের ছাঁচ (brass tool) আছে একই

ডৌলের। ওদের ওপর গলানো সীসে ঢেলে ঐ ডৌলের সীসের ছাঁচ তৈরি করে নেওয়া যায়। সীসের ছাঁচ তুলবার সময় পেতলের ছাঁচকে একটা টিনের দু-ইঞ্চি চওড়া পাত দিয়ে ঘিরে নেবে, তার মধ্যে সীসে (lead) গলিয়ে ঢালবে। লোহার হাতায় করে উনোনের আগুনে সীসে গলাতে পারবে। সীসের গুলি কিনতে পাওয়া যায় লোহালক্করের দোকানে ; পাউণ্ড দরে বা সের দরে বিক্রি হয়, দাম সস্তা।

সীসের ছাঁচ দিয়ে রাফ-গ্রাইণ্ডিং-এর কাজ যতোটা সম্ভব সেরে নেবে। তারপর মাঝারি দানার কার্বোরাণ্ডাম দিয়ে পেতলের ভাল ছাঁচ ব্যবহার আরম্ভ করবে। গ্রাইণ্ড করবার সময় ছাঁচটা একভাবে লেন্সের ওপর ধরে থেকো না, অল্প অল্প এপাশ ওপাশ করবে ও ছাঁচটাকে একটু একটু করে ঘুরিয়ে ধরবে। নাহলে লেন্স ও ছাঁচের পিঠে দাগ ধরতে পারে।

মাঝারি কার্বো দিয়ে ঘষতে ঘষতে যখন মনে হয় পাড়ান্ হয়েছে অর্থাৎ কাচের আর ছাঁচের ডোল একেবারে মিলে গিয়েছে, তখন সব ধুয়ে ফেলে পরের নম্বরের মিহি কার্বো ব্যবহার করবে। এইভাবে যতবার মোটা থেকে মিহির দিকে গুঁড়ো বদলাবে ততবার কাচ ও ছাঁচ ভালো করে ধুয়ে নেবে। প্রত্যেকবার দেখে নেবে লেন্সের পিঠে কোনও আঁচড়ের দাগ (scratch) আছে কিনা। থাকলে একই গুঁড়ো দিয়ে গ্রাইণ্ড করে দাগ তুলে ফেলতে হবে। তারপর ধুয়ে গুঁড়ো বদলাবে। এইভাবে 2F,3F বা ঐ রকম মিহি

কার্বোরাণ্ডাম অবধি যাবে। গ্রাইণ্ডিং-এর সময় গুঁড়ো যেন কখনো শুকিয়ে না যায়।

সবচেয়ে মিহি কার্বোরাণ্ডামের কাজ শেষ হ'লে সব ধুয়ে ফেল। এবার মিহি এমারি (emery) গুঁড়ো দিয়ে সবচেয়ে ফাইন গ্রাইণ্ডিং শেষ করতে হবে। গুঁড়ো যেন শুকিয়ে না যায়, লক্ষ্য রেখো। মধ্যে মধ্যে লেন্স ও ছাঁচের ওপর ফোঁটা ফোঁটা করে জল দেবে।

এমারি গুঁড়োয় ধুলো, বালি বা অন্য কোনো মোটা দানা মিশে থাকতে পারে। থাকলে লেন্সের পিঠে দাগ পড়ে সর্বনাশ করবে। সেজন্য এমারি গুড়ো পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। দু-চার চামচ এমারি গুঁড়ো এক গ্লাস জলে গুলে নাও। খুব করে চামচ দিয়ে নেড়ে আধ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখো, মোটা দানা কিছু থাকলে নিচে থিতোবে। ওপরের ঘোলা জলটা অন্য গ্লাসে ঢেলে নাও, এর মধ্যেই খুব মিহি এমারি আছে। এটাকে কয়েক ঘণ্টা বা সারারাত থিতোতে দাও। পরে জল ফেলে দিয়ে তলার এমারি একটা পরিষ্কার কৌটোয় ভরে ব্যবহার করো।

ভাল ভাবে এমারি দিয়ে ফাইন গ্রাইণ্ডিং শেষ হলে সব ধুয়ে ফেলো। জল শুকিয়ে গেলে লেন্সের পিঠটা ধূসর ঝাপসা দেখাবে। এবার রুজ দিয়ে পালিশ করতে হবে।

পালিশ করবার ছাঁচ তৈরি করতে হবে পিচ (pitch) দিয়ে। খুব সহজ। একটা কাঠের টুকরো নাও, লেন্স থেকে একটু বড়ো। কাঠের ওপর একটু গরম করা পিচের গুলি

থেবড়ে লাগিয়ে দাও। নরম থাকতে থাকতে জলে ভেজানো লেন্সের পিঠের ওপর চেপে ধরো (এ সময় চরকি কাঠি ঘোরাবে না)। তাহলেই লেন্সের ডৌল সমান ছাঁচে উঠবে। যদি একবারে ভালো ছাঁচ না ওঠে তাহলে পিচটা স্পিরিট ল্যাম্পে তাতিয়ে নরম করে নিয়ে আবার ছাঁচ তোলো। লেন্সটায় জল বা সাবান-জল মাখানো থাকলে নরম পিচ লেগে যাবার ভয় থাকবে না। পিচের ছাঁচ তৈরী হলে বাটির জলে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে নাও। পিচ শক্ত হলে কিনার বাড়তি পিচ ছুরি দিয়ে ছেঁটে পরিষ্কার করে নাও।

এবার একটা পরিষ্কার বাটিতে একচামচ আন্দাজ রুজ আর দু-চামচ জল মেখে নাও। কাঠির আগায় পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে একটা ছোট তুলি করে নাও। তুলি দিয়ে রুজ নিয়ে লেন্স ও পিচের ছাঁচের ওপর লাগিয়ে দাও। এবার চরকি কাঠি ঘোরাও, পিচের ছাঁচ দিয়ে পালিশ চালাও। জল বা রুজ কমে গেলে দিয়ে নেবে। পিচের ছাঁচের পিঠে একটা খাঁজ কেটে নিলে ভাল। খাঁজের মধ্যে রুজ ঢুকে পালিশের সাহায্য করবে। কয়েক মিনিট পালিশ করার পরেই বুঝতে পারবে লেন্সের পিঠ পালিশ নিচ্ছে, ঝাপসা কাচের পিঠে স্বচ্ছতা ফিরে আসছে। এইভাবে যখন কাঠের পিঠের সবটা পরিষ্কার স্বচ্ছ দেখবে তখন বুঝবে পালিশের কাজ শেষ হ'য়েছে। লেন্স তৈরী হয়ে গেলো

॥ পাঁচ ॥

সহজ বীক্ষণ যন্ত্রাবলী

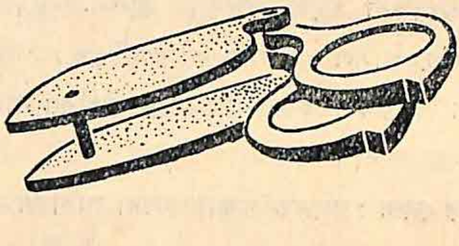
লেন্স তৈরি করতে জানলে নানারকমের ছোটোখাটো বীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি করা যায়। তার জন্যে হয়তো টিনের চোং, কাঠের বা টিনের বাক্স, পেতলের নল ইত্যাদি দরকার হবে। ভালো করে তৈরি করতে পারলে কোনো কোনো বীক্ষণ-যন্ত্র কুটির শিল্প হিসাবে আয়করী হতে পারে। বীক্ষণ-যন্ত্রের কাঁচামালের দাম খুব অল্প, আসল দাম সূক্ষ্ম কারিগরিতে।

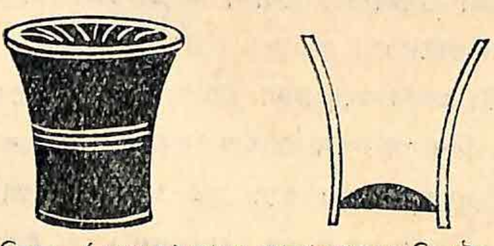
গোটা কয়েক সহজ বীক্ষণ-যন্ত্র তৈরির সাধারণ পদ্ধতি এই অধ্যায়ে দেবো।

চশমার লেন্স : অনেক শস্তার চশমা সাধারণ কাচের লেন্স দিয়ে তৈরি হয়। যারা চশমার লেন্স তৈরি করার ব্যবসা করে তারা চশমার উপযোগী কাচের চাক্তি বা ব্ল্যাঙ্ক পাইকারি দরে কেনে।

একটা একটা করে লেন্স তৈরি করলে খরচ বেশি পড়ে। একসঙ্গে বিশ পঁচিশটা গ্রাইণ্ড করতে পারলে শস্তা পড়ে। লেন্সের যেরকম ডৌল হবে সেই অনুসারে ঢালাই লোহার বড়ো চাকা তৈরি করতে হয়, ধরো দশ-বারো ইঞ্চি ব্যাসের। এর ওপর এক পর্দা গলানো রজন ঢেলে তার ওপর লেন্সের

ব্র্যাঙ্কগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটা বারো ইঞ্চি লোহার চাকার পিঠে গোটা ত্রিশেক কাচ বসানো যাবে। কাচগুলি ঠিকমতো রজন দিয়ে আটকালে আর একটা লোহার তাওয়ার মতো ছাঁচ দিয়ে ঘষতে হবে। আগে যেমন বলেছি, কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো আর জল দিয়ে ঘষতে হবে। প্রথমে মোটা দানার, পরে মিহি দানার কার্বো, শেষে এমারি গুঁড়ো। সবশেষে পিচের ছাঁচ দিয়ে রুজ মাখিয়ে পালিশ করতে হবে। এক পিঠ হয়ে গেলে রজন থেকে কাচ খুলে নিয়ে উলটে লাগাতে হবে, আবার ঐ পিঠে গ্রাইণ্ড, পালিশ করতে হবে।

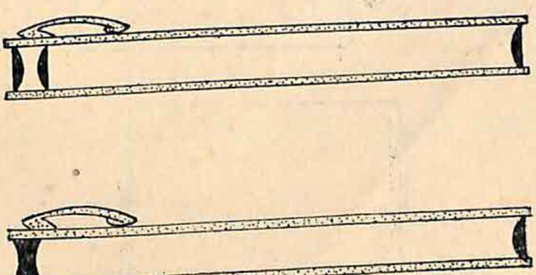




10 নং চিত্র। (ওপরে) খাপে ঢোকানো ম্যাগনিফাইং গ্লাস
(নীচে) ঘড়ি সাড়ানোর চোখের ঠুলি, সেটাও
ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস : ছোটো ফোকাসের ডবল কনভেক্স লেন্স দিয়ে সাধাসিধে ম্যাগনিফাইং গ্লাস হয়। লেন্সটা একটা পেতলের আংটার মধ্যে বসিয়ে হাতল লাগিয়ে দিলেই হলো। পেতলের অংশটা নিকেল প্লেট করে নিলে সুন্দর দেখাবে। বাজারে এইরকমই পাওয়া যায়। কাঠের বা প্লাষ্টিকের হাতলও হয়। এই ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস বেশি শক্তি-শালী হয় না, ম্যাগনিফাইং পাওয়ার সাধারণত দুই থেকে পাঁচের মধ্যে থাকে, বেশি শক্তি করতে হলে একজোড়া প্লেনো কনভেক্স হলে ভালো হয়।

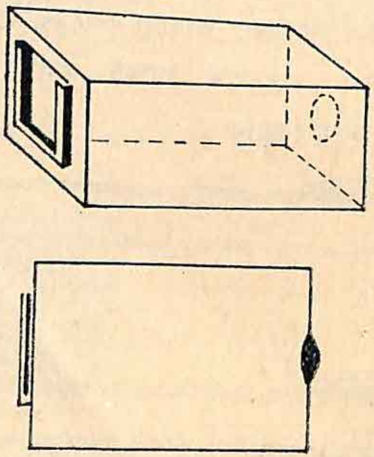
পকেট কলম মাইক্রোস্কোপ : একটা কলমের মতো পেতলের নলের দু দিকে দুটো লেন্স দিয়ে এরকম মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা যায়। এর পরিবর্ধন-শক্তি বা ম্যাগনিফাইং পাওয়ার কুড়ি-ত্রিশ মতো হতে পারে। পেতলের নলের সঙ্গে একটা ক্লিপ লাগাও, তাহলে কলমের মতো বুকপকেটে রাখতে পারবে। এরকম পকেট কলম মাইক্রোস্কোপ জিওলজিস্টরা নিয়ে বেড়ান।



11 নং চিত্র। পকেট কলম মাইক্রোস্কোপ

সামনের লেন্সটাকে বলে অবজেক্ট গ্লাস (object glass) চোখের কাছের লেন্সটাকে বলে আই–পীস (eye piece)। অবজেক্ট গ্লাস হবে প্লেনো কনভেক্স, ফোকাল লেংথ আধ থেকে এক ইঞ্চির মতো। আইপীসটা কনকেভ বা কনভেক্স লেন্স হতে পারে, ফোকাল লেংথ এক বা দেড় ইঞ্চির মতো। পেতলের নলটা নিকেল প্লেট করে নিলে সুন্দর দেখাবে।

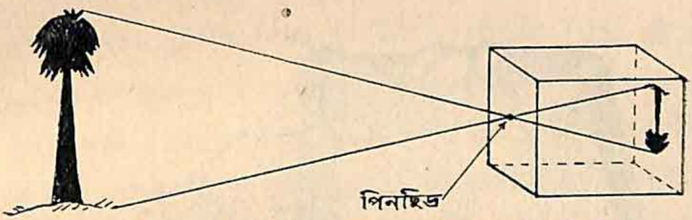
ভিউয়ার (Viewer) : কাটা ফিল্ম-এর ছবি বড়ো করে দেখবার 'ভিউয়ার' খুব সহজেই তৈরি করা যায়। একটা দু ইঞ্চি লম্বা চোং তৈরি করো। এক দিকে ফিল্ম ধরবার ফ্রেম দাও, অন্য দিকে আড়াই ইঞ্চি ফোকাল লেংথ-এর কনভেক্স লেন্স বসাও। লেন্সের মধ্য দিয়ে ছবিটা বড়ো করে দেখতে পাবে। ফ্রেমে বদলে বদলে ফিল্ম দাও আর নানা রকমের ছবি দেখো।



12 নং চিত্র। ভিউয়ার

পিন-হোল ক্যামেরা : একটা চার-পাঁচ ইঞ্চি মাপের কার্ডবোর্ডের বা কাঠের বাক্স নাও।

সামনে একটা আধ ইঞ্চি ফুটো করে একটা পোস্ট-কার্ডের টুকরো আঠা দিয়ে মেরে দাও। এই পাতলা কার্ডের মধ্যে পিন দিয়ে একটা ছোট্ট ফুটো করো। বাক্সের উলটো দিকটা খোলা রাখো। সেখানে একটা পাতলা সাদা কাগজ ধরো। বাইরের জিনিসের ছবি পিন-ফুটো



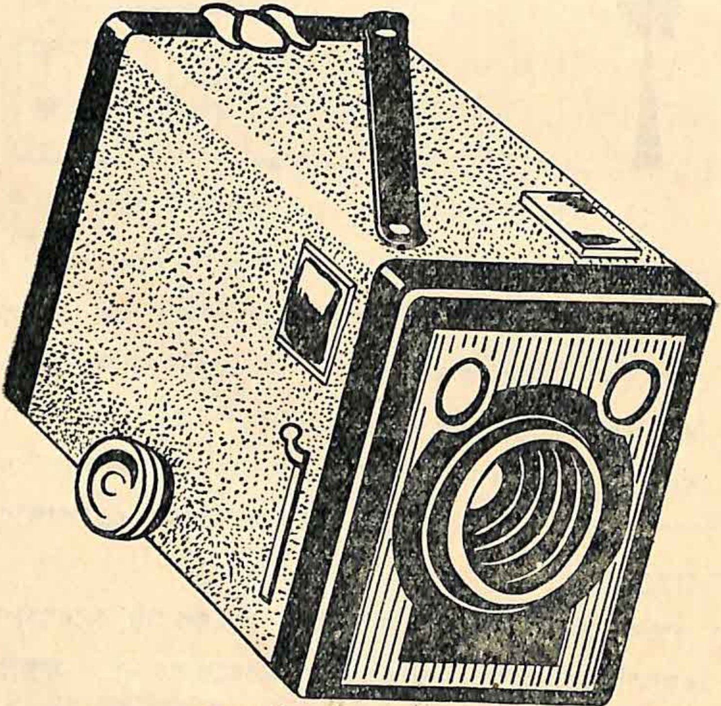
13 নং চিত্র। পিন-ছিদ্র কামেরা (Pinhole Camera)

দিয়ে এসে সাদা কাগজের ওপর উলটো হয়ে পড়বে। পিন-ফুটো দিয়ে খুব অল্প আলো আসবে, ছবি খুব উজ্জ্বল দেখাবে না। সে জন্য মাথার ওপর একটা কালো চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, এখন বেশ দেখতে পাবে। এই হলো pinhole camera। সাদা কাগজের জায়গায় ফিল্ম লাগাতে পারলে ফোটো তুলতে পারো। কিন্তু অনেকক্ষণ এক্সপোজার লাগবে।

বক্স-ক্যামেরা : পিনহোল ক্যামেরার জোর খুব অল্প, অনেকক্ষণ এক্সপোজার লাগে। ছবিও খুব পরিষ্কার হয় না। সস্তার বক্স ক্যামেরাতে বেশ ছবি তোলা যায়। সামনে থাকে একটা

ছোট কনভেক্স লেন্স, ফোকাল লেংথ প্রায় পাঁচ ইঞ্চির মতো।

একটা মাপসই কাঠের বাক্স দিয়ে এবং একটা ঐরকম কনভেক্স লেন্স দিয়ে বক্স ক্যামেরা তৈরি করা যায়। বাক্সের সামনের যে ফুটোর ওপর লেন্স বসাবে সেটার মাপ (অর্থাৎ ছিদ্রটার মাপ) আধ ইঞ্চির একটু ছোটো হওয়া ভালো, $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি হলে চলবে। লেন্সটাকে একটা ছোটো পেতলের নলের মধ্যে বসিয়ে, নলটা কাঠের বাক্সের সঙ্গে এঁটে



14 নং চিত্র। বক্স ক্যামেরা

দেওয়া যেতে পারে। কাঠের বাক্সটায় যেন ফুটোফাটা কোথাও না থাকে। থাকলেই ফিল্মটা নষ্ট হয়ে যাবে। বাক্সের পিছনে ফিল্ম জড়ানোর বা প্লেট বসানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। খুব সাবধান, আলো যেন না ঢুকতে পারে।

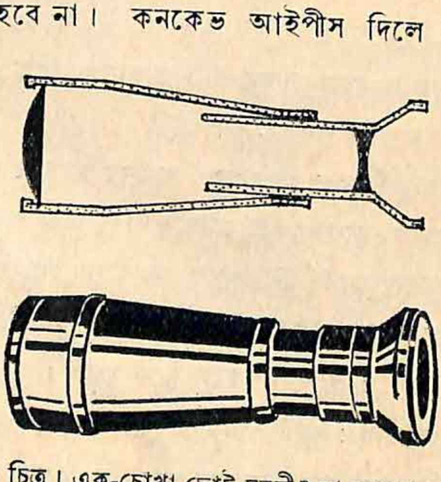
আর একটা জিনিস বাকি থাকল। সেটা হচ্ছে শাটার (shutter), যেটা টিপে এক্সপোজার (exposure) দেওয়া হয়। শাটার তৈরি করা একটু শক্ত। তাহলেও ব্যাপারটা বলে রাখি। লেন্সের পিছনে একটা টিনের বা পেতলের পাত থাকবে, মধ্যে $\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি আন্দাজ ছিদ্র। পাতটা স্প্রিং দিয়ে এমনভাবে টানা থাকবে যাতে লেন্সের মুখটা ঢাকা থাকে। এবার বাইরে থেকে পাতটাকে টিপলে এর ফুটোটা লেন্সের ফুটোর ওপর দিয়ে চট করে চলে যাবে, সেই মুহূর্তে এক্সপোজার হবে। স্প্রিং এর জোর এমন করে বেঁধে দিতে হবে যাতে এক্সপোজার হয় $\frac{১}{২৫}$ বা $\frac{১}{৫০}$ সেকেণ্ডের মতো। দামী ক্যামেরায় অন্য রকম শাটার থাকে, স্প্রিংএর জোরও ইচ্ছেমতো কমবেশি করা যায়।

নিজের তৈরি বক্স ক্যামেরায় শাটার ছাড়াও ছবি তোলা যায়। লেন্সের মুখে একটা ঢাকনি দাও, এক্সপোজার দেবার সময় টুক করে ঢাকনিটা খুলে আবার বন্ধ করে দাও। তাহলে ক্যামেরাকে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর বা টেবিলের ওপর বসিয়ে ছবি তুলতে হবে, না হলে নড়ে যাবে।

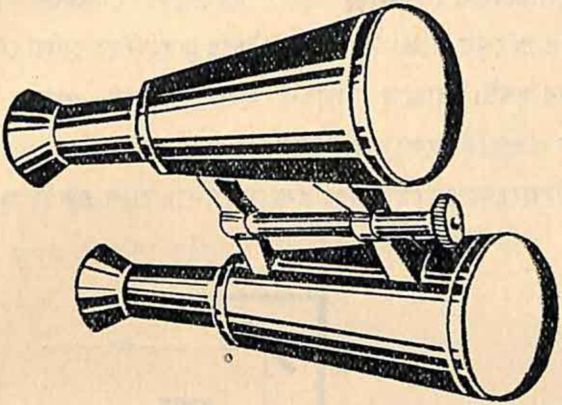
ছোটো দূরবীন : দুটো টিনের চোং নাও, একটার মধ্যে অন্যটা যেন মাপে মাপে ঢুকতে পারে। বড়ো চোঙের মুখে

একটা প্লেনো কনভেক্স লেন্স লাগাও (ডৌল দিকটা বাইরে থাকবে)। ফোকাল লেংথ ছ ইঞ্চি দিও। অন্য চোঙের মুখে একটা কনকেভ লেন্স বসাও, ফোকাল লেংথ তুইঞ্চির মতো। তুটো চোং ঠেলে বা টেনে ফোকাস ঠিক করে নাও। এই দূরবীনে দূরের জিনিস তিন গুণ বড়ো হয়ে দেখাবে। সামনের কনভেক্স লেন্সটাকে বলে অবজেক্ট গ্লাস (object glass), চোখের কাছেরটা আই পীস (eye piece)। অবজেক্ট গ্লাসের ফোকাল লেংথকে আইপীসের ফোকাল লেংথ দিয়ে ভাগ করলে দূরবীনের পরিবর্ধনশক্তি (manifying power) পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে হলো $6 \div 2 = 3$ পরিবর্ধন-শক্তি।

এখানে আইপীসে কনকেভ লেন্স দিয়েছি। কনভেক্স আইপীসও দেওয়া যায়। কনভেক্স আইপীস ব্যবহার করলে নলতুটোকে টেনে আর একটু লম্বা করে নিতে হবে, নাহলে ফোকাস হবে না। কনকেভ আইপীস দিলে ছবি সোজা



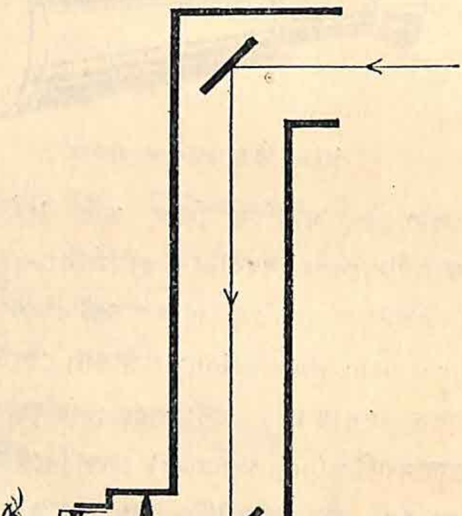
15 নং চিত্র। এক-চোখা ছোট দূরবীণ বা ম্যানোকুলার



16 নং চিত্র। বাইনোক্যুলার

দেখাবে, কনভেক্স আইপীস দিলে ছবি উল্টো দেখাবে। কনকেভ আইপীস দেওয়া দূরবীনকে গ্যালিলিও-দূরবীন বলে। এর আর একটা সুবিধা এই যে, অবজেক্ট লেন্সের বর্ণাপেরণ দোষ (chromatic aberration) অনেকটা কেটে যায়, ছবি রংচঙে জ্যাবড়া দেখায় না। বর্ণাপেরণ দোষ দূর করতে হলে দামী অ্যাক্রোম্যাটিক (achromatic) লেন্স দিয়ে অবজেক্ট গ্লাস তৈরি করতে হয়। অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স সম্বন্ধে পরে বলেছি। সস্তার বাইনোকুলার বা ফিল্ড গ্লাস (field glass) গ্যালিলিও-জাতের দূরবীন, সামনে সাধারণ একটি কনভেক্স লেন্স এবং আইপীসটি কনকেভ লেন্স। ছোটো দূরবীনকে মনোক্যুলার (monocular) বলে, এক চোখ দিয়ে দেখতে হয়। দুটো পাশাপাশি থাকলে দু চোখ দিয়ে দেখা যায়, তাকে বলে বাইনোক্যুলার (binocular)।

পেরিস্কোপ : খেলার মাঠে দেখেছো কেউ কেউ একটা হাতীর শুঁড়ের মতো নল উঁচিয়ে তার মধ্য দিয়ে খেলা দেখছে; শুঁড়ের মুখটা সামনে ভিড়ের সবার মাথার ওপরে জেগে আছে। ওটাই হলো পেরিস্কোপ (periscope) : নলের ওপরে একটা আয়না তেরছা করে বসানো, নিচে আর একটা আয়না।



17 নং চিত্র পেরিস্কোপ

দুই আরমায় আলো ঠিকরে চোখে আসছে। ওপরের আয়নাটা সবার মাথার ওপর বলে দৃষ্টি আটকাচ্ছে না। এই ভাবে দুই আয়নার সাহায্যে ভিড়ের মধ্যেও খেলা দেখতে

অসুবিধা হচ্ছে না। নিচের আয়নায় সামনে বাইনোকুল্যার লাগানো থাকলে তো কথাই নেই।

ডুবো জাহাজে পেরিস্কোপ থাকে, মাথাটা জেগে থাকে জলের ওপর। ওপরের আয়না দিয়ে ছবি এসে পড়ে ডুবো জাহাজের মধ্যে। ডুবো জাহাজের মধ্যে বসে দেখা যায় জলের ওপর কোনো জাহাজ যাতায়াত করছে কি না।

॥ ছয় ॥

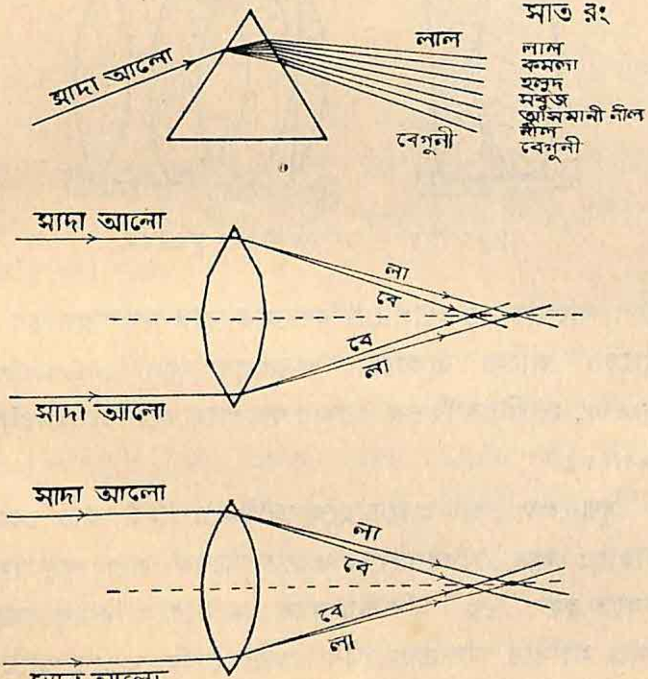
সরল লেন্সের বর্ণাপেরণ দোষ

॥ যুগ্ম লেন্স ॥

নানা রকম সহজ বীক্ষণ-যন্ত্র তৈরির কথা এইমাত্র বললাম। ঐ যন্ত্রে সরল লেন্স (Simple lens বা Single lens) ব্যবহার করা হয়েছে। আলাদা একটিমাত্র লেন্সকে একক বা সরল লেন্স বলে। লেন্সের মধ্য দিয়ে বেঁকবার সময় আলো রামধনু রঙে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেমন ত্রিকোণ কাচ বা প্রিজম (Prism)-এর মধ্য দিয়ে হয়। লেন্স যতো শক্তিশালী হবে আলোর রঙ ততো বেশি বিভক্ত হয়ে বেরুবে। এরকম হলে লেন্স দিয়ে যে প্রতিচ্ছবি (image) সৃষ্টি হবে সেটা স্পষ্ট হবে না, রংচঙে জ্যাবড়া দেখাবে। সস্তা পত্রিকায় রঙীন ছবি ছাপার দোষে যেমন দেখায়, অনেকটা সেইরকম। এই কারণে সরল লেন্সের বীক্ষণ-যন্ত্র বেশি শক্তিশালী করা যায় না। লেন্সের মধ্য দিয়ে রঙ আলাদা হয়ে যাওয়ার দোষকে বলে লেন্সের বর্ণাপেরণ দোষ (Chromatic aberration)।

লেন্সের বর্ণাপেরণ দূর করতে হলে যুগ্ম-লেন্স (Combination Lens) ব্যবহার করতে হয়। বর্ণাপেরণ দোষ

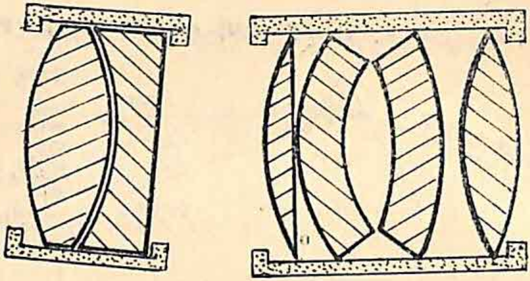
দূর করা যুগ্ম-লেন্সকে বলে অবার্ণ লেন্স বা অ্যাক্রোম্যাটিক (achromatic) লেন্স। এরকম যুগ্ম-লেন্স তৈরি করা একটু কঠিন। যুগ্ম-লেন্স তৈরি হয় কনকেভ-কনভেক্স লেন্স পিঠে পিঠে জুড়ে। জোড়া বা যুগ্ম-লেন্স-এর প্রত্যেকটি লেন্স হয়



18 নং চিত্র। লেন্স-এর বর্ণাপেরণ।

ত্রিকোণ কাচে যেমন সাদা রং ভেঙে রঙিন হ'য়ে বেরোয়, লেন্সের মধ্য দিয়েও তেমনি বর্ণাপ্রেরণ হয়। অনেকগুলি ত্রিকোণ কাচ সাজিয়ে যেন লেন্স তৈরি হ'য়েছে, এমনভাবে কল্পনা করতে পারো, যেমন ছবিতে ধাপে ধাপে দেখান হয়েছে।

বিভিন্ন কাচের, একটা ক্রাউন কাচ, অন্যটা ফ্লিন্ট কাচ। দুই জাতের কাচের আলো বাঁকানোর ক্ষমতার তফাত আছে এবং



19 নং চিত্র। অ্যাক্রোম্যাটিক যুগ্ম-লেন্স

সাদা আলোর রঙ বর্ণালীতে বিভক্ত করবার ক্ষমতারও তফাত আছে। আলো বাঁকানোর ক্ষমতাকে বলে refracting power, বর্ণালীতে বিভক্ত করবার ক্ষমতাকে বলে dispersing power।

যুগ্ম-লেন্স তৈরি করতে হলে ক্রাউন ও ফ্লিন্ট কাচ চাই। তাছাড়া লেন্স তৈরির হিসাব করতে অনেক শক্ত শক্ত অঙ্ক কষতে হয়। কেউ যদি অঙ্ক কষে দেন তাহলে বিদেশ থেকে কাচ আনিয়ে অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স তৈরি করতে পারো। যে সব বড়ো দোকান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিক্রি করে তাদের কাছে অর্ডার দিয়ে প্রয়োজনমতো অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স কিনতে পারো।

অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স তৈরি বা জোগাড় করতে পারলে ভালো জাতের বীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি করা যায়।

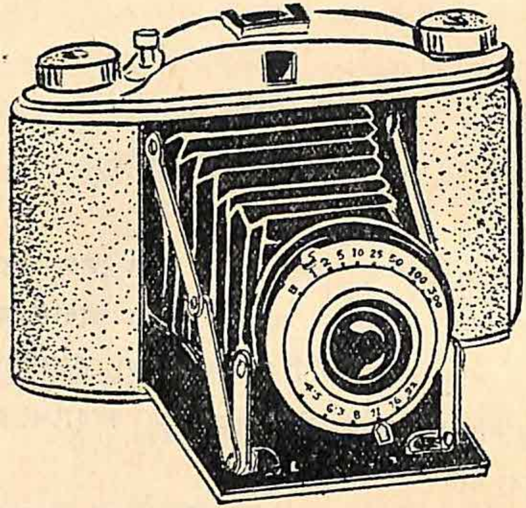
॥ সাত ॥

ক্যামেরা

বক্স-ক্যামেরার কথা আগে বলেছি। সরল লেন্স দিয়ে বক্স-ক্যামেরা তৈরি হয়। সরল লেন্সের প্রধান অসুবিধা বর্ণাপেরণ দোষ, এজন্য এ দিয়ে জোরালো ক্যামেরা তৈরি করা যায় না। অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স দিয়ে জোরালো ক্যামেরা তৈরি করা যায়।

জোরালো ক্যামেরা মানে কী? যে ক্যামেরায় কম আলোতে ছবি তোলা যায় তাকে জোরালো (powerful) ক্যামেরা বলে। সরল লেন্সের বক্স-ক্যামেরা দিয়ে রোদের মধ্যে বা ঘরের বাইরে যথেষ্ট আলো থাকলে ছবি তুলতে পারা যায়। কিন্তু আলো কমে গেলে বা ঘরের মধ্যে (ফ্ল্যাশ লাইট ছাড়া) ছবি তোলা যায় না। বক্স-ক্যামেরায় লেন্সের মুখ অ্যাপার্চার (aperture) খুব ছোটো রাখা হয়, কারণ তাতে সরল লেন্সের বর্ণাপেরণ ইত্যাদি দোষ ততোটা বোঝা যায় না, ছবি মোটামুটি স্পষ্ট ওঠে। লেন্সের মুখ বা বা অ্যাপার্চার ছোটো রাখার ফলে ক্যামেরার ছবি খুব উজ্জ্বল হতে পারে না, তাই বেশি আলোর দরকার হয় বা বেশি সময় এক্সপোজার লাগে।

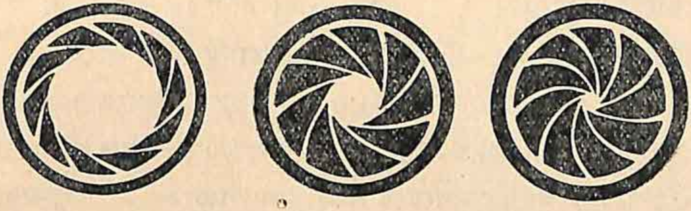
লেন্সের অ্যাপার্চার বলতে কী বোঝায় তা একটু বলা



20 নং চিত্র। ক্যামেরা

দরকার। অ্যাপার্চার বলতে f/4·5, f/8, f/11 ইত্যাদি শুনেছো। এর মানে কী? লেন্সের জোর বা লেন্স-সৃষ্ট প্রতিচ্ছবির (image) উজ্জ্বলতা নির্ভর করে এই সংখ্যার ওপর। লেন্সের অ্যাপার্চার বা মুখ শুধু ইঞ্চি মেপে ঠিক করা যায় না, অর্থাৎ ছবির উজ্জ্বলতা শুধু লেন্স-মুখের ইঞ্চির মাপের ওপর নির্ভর করে না। ধরো, দুটো ক্যামেরাতেই আধ ইঞ্চি মাপের লেন্স-মুখ, কিন্তু ফোকাল লেংথ ছোটো বড়ো। একই মাপের লেন্স-মুখ হওয়াতে দুটো ক্যামেরাতেই সমান পরিমাণ আলো ঢুকবে। কিন্তু যেটার ফোকাল লেংথ্ বড়ো, সে ক্যামেরায় ছবি বড়ো হবে, ছবির উজ্জ্বলতা কম হবে। অন্যটায় ছবি ছোটো হবে, ফলে ছবির উজ্জ্বলতা বেশি হবে।

তাহলে দাঁড়ালো, ছবির উজ্জ্বলতা বা ক্যামেরার জোর নির্ভর করবে লেন্স-মুখের মাপ আর ফোকাল লেংথএর মাপের ওপর, দুটোয় মিলে। প্রকৃত পক্ষে লেন্সের মুখের



21 নং চিত্র। লেন্সের উন্মেষ বা aperture বড়-ছোট করা

মাপ ফোকাল লেংথ-এর কতো ভাগ, সেটাই জানা দরকার, সেটাই হলো লেন্সের অ্যাপার্চার বা opening বা উন্মেষ।

মনেকরো, লেন্সের মুখের ব্যাস আধ ইঞ্চি, ফোকাল লেংথ সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। তাহলে দাঁড়ালো লেন্স মুখের সাইজ ফোকাল লেংথএর এগারো ভাগের এক ভাগ : $5\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = 11$। তাহলে ক্যামেরা লেন্সের অ্যাপার্চার বা উন্মেষ হলো f/11 এক্ষেত্রে এগারো হলো aperture ratio বা উন্মেষ সংখ্যা। ফোকাল লেংথকে লেন্স মুখের ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে উন্মেষ সংখ্যা পাওয়া যায়। ধরো ফোকাল লেংথ 6 ইঞ্চি, আর লেন্স মুখের মাপ $1\frac{1}{3}$ ইঞ্চি। তাহলে লেন্সের উন্মেষ সংখ্যা হবে $6 \div 1\frac{1}{3} = 4{\cdot}5$ (সাড়ে চার)। লিখতে হবে: উন্মেষ f/4·5। উন্মেষ সংখ্যা যতো ছোটো হবে লেন্সের মুখ বা উন্মেষ ততো বড়ো হবে, ক্যামেরা ততোই জোরালো হবে।

ভালো ক্যামেরায় আলোর তেজ বুঝে লেন্সের অ্যাপার্চার ছোটো-বড়ো করা যায়। লেন্সের পিছনের একটা ডায়াফ্রাম বা ধাতুর পর্দা থাকে, তার মধ্যে গোল ছিদ্র। এই ছিদ্র ছোটো-বড়ো করা যায় একটা কাঁটা সরিয়ে। এই কাঁটার নীচে উন্মেষ সংখ্যা 4·5, 6·3, 8, 11 ইত্যাদি লেখা থাকে।

সাধারণ কাজের পক্ষে f/4·5 অ্যাপার্চারের ক্যামেরা যথেষ্ট জোরালো। কোনও ক্যামেরায় লেন্স f/4·5 বলতে বোঝায় f/4·5 ই হলো এর সবচেয়ে বড়ো অ্যাপার্চার, কাঁটা ঘুরিয়ে অবশ্য ছোটো করা যায় f/22 পর্যন্ত। আজকাল অনেকে f/3·5 লেন্সের ক্যামেরা কেনে। f/4·5 এর চেয়ে f/3·5 বেশি জোরালো, f/2·5 আরো জোরালো। সাধারণ অ্যামেচার ফোটোগ্রাফারদের পক্ষে f/3·5 বা f/2·5 খুব যে কাজে আসে তা নয়। কারণ সখের ছবি তোলায় কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই ; আলো থাকলে তুললাম, না থাকলে তুললাম না। বেড়াতে গেলে, পিকনিক করতে গেলে আমরা ছবি তুলি। তখন যথেষ্ট আলো থাকে, এবং বেশির ভাগ সময়েই আমরা স্টপ ডাউন করে f/11 বা f/18 এ ছবি তুলি। যাদের f/4·5 ক্যামেরা আছে তারাও কদাচিৎ পুরো অ্যাপার্চারে ছবি তোলে। অথচ ক্যামেরার লেন্স যতো জোরালো হবে দামও তেমনি বাড়বে।

কিন্তু ছবি তোলা যাদের পেশা, যেমন প্রেস-ফোটো-গ্রাফার বা খবরের কাগজের জন্য যারা ছবি তোলে,—তাদের খুব জোরালো ক্যামেরা থাকা বিশেষ দরকার। হয়তো

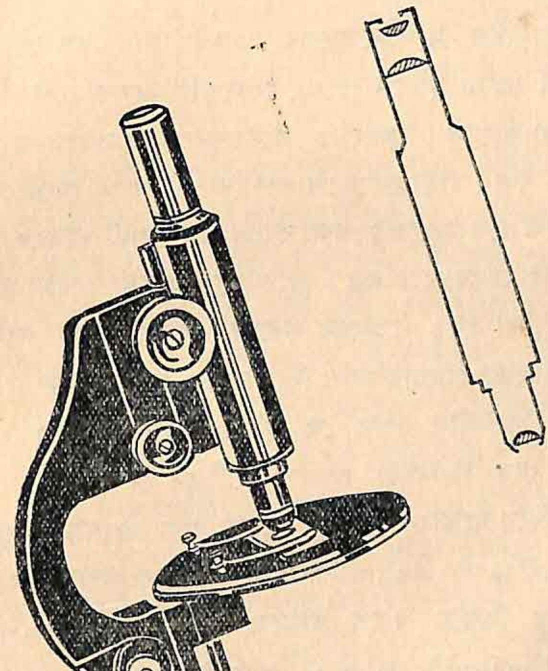
সামিয়ানার নিচে নেহেরু বক্তৃতা দিচ্ছেন, আলো কম। বা, সন্ধ্যাবেলা মোটরে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, খবরের কাগজে ছবি উঠবে। কিম্বা, বর্ষাকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, শীল্ড ফাইনাল খেলা হচ্ছে, পরদিন ফুটবল খেলার ছবি কাগজে বেরুবে। এসব ক্ষেত্রে খুব জোরালো ক্যামেরা দরকার। কিম্বা ধরো ঘোড়দৌড়ের ছবি। তখন হয়তো এক্সপোজার (exposure) দিতে হবে 1/500 সেকেণ্ড বা 1/1000 সেকেণ্ড। খুব জোরালো ক্যামেরা চাই রেসের ছবি তুলতে। এ সব ক্ষেত্রে লেন্সের অ্যাপার্চার f/2· মতো হলে ভালো। সে-রকম ক্যামেরার দামও তেমনি!

ছবি তোলা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে 'আমরাও হতে পারি' গ্রন্থমালার কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যয়ের লেখা ফোটোগ্রাফির বই থেকে।

॥ আট ॥

অনুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ

জোরালো ম্যাগনিফাইং গ্লাসকে সরল মাইক্রোস্কোপ বলা যায়। কারণ, এ দিয়ে খুদে জিনিসকে বড়ো করে দেখা যায়। প্রায় দুশো আশী বছর আগে হল্যাণ্ডে লিউয়েনহোক (Anteny Leeuwenhoek) নামে একজন সামান্য দোকানদার বাড়ি বসে লেন্স তৈরি করে খুদে জিনিস পরীক্ষায় মেতে গেলেন। এই হলো প্রথম মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র। লিউয়েনহোক তাঁর লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন পিঁপড়ের দাঁড়া, মাছির চোখ, মৌমাছির হুল, মাংসের টিস্যু, ফলের বীজ, ফুলের রেণু, পোকামাকড়,—কিছুই তিনি তাঁর মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করতে ছাড়লেন না। এই নেশা থেকেই তিনি জীব ও উদ্ভিদ-জগতের অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন। আর আবিষ্কার করলেন রোগের বীজাণু। লিউয়েনহোক লেখাপড়া বেশি জানতেন না। হল্যাণ্ডেই থাকতেন, শুধু দেশী ওলন্দাজ ভাষা জানতেন। লেখাপড়া-জানা লোকদের মতো ইংরাজী ফরাসী কিছুই জানতেন না। তবু মাইক্রস্কোপ দিয়ে তিনি যা দেখলেন তা ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড়ো সভা রয়েল সোসাইটিতে



22 নং চিত্র। মাইক্রস্কোপ

জানালেন ওলন্দাজ ভাষায়, অমার্জিত রচনায়। বৈজ্ঞানিকরা ধন্য ধন্য করে উঠলেন।

আধুনিক মাইক্রস্কোপের একটা ছবি এখানে দেওয়া হলো। 22 নং ছবিতে দেখো, লেন্সগুলি নলের মধ্যে কী ভাবে বসানো হয়েছে। আগেও মাইক্রোস্কোপ সম্বন্ধে বলেছি — পকেট কলম মাইক্রোস্কোপ সম্পর্কে। নলের নিচে যে লেন্স সেটাকে বলে অবজেক্ট লেন্স, কারণ এর নিচেই থাকবে দেখবার অবজেক্ট বা দেখবার বস্তু। খুদে বস্তুটি একটা কাচের শ্লাইডের ওপর রাখা হয়। চোখের কাছের লেন্সকে বলে আইপীস।

অবজেক্ট লেন্সের মধ্যে দিয়ে নলের ভেতর বড়ো করে ছবি পড়ে, আইপীস দিয়ে সে ছবিটা আরো বড়ো দেখায়। অর্থাৎ খুদে জিনিসটা দুধাপে বাড়িয়ে দেখা হয়। অবজেক্ট লেন্স দিয়ে যতোগুণ বাড়ে তাকে বলে প্রাথমিক-পরিবর্ধন বা primary magnification, আবার আইপীসের জোর অনুসার দ্বিতীয় ধাপে বাড়লে পাওয়া যায় পূর্ণ-পরিবর্ধন (total magnification)। অবজেক্ট লেন্সের ফোকাল লেংথ যতো ছোটো হয়, প্রাথমিক পরিবর্ধন সেই অনুপাতে বেশি হয়। আইপীসের বেলাতেও তাই।

ভালো মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে দু-তিনটে অবজেক্ট লেন্স ও দু-তিনটে আইপীস থাকে, বিভিন্ন শক্তির। ফলে ইচ্ছামতো অবজেক্টিভ-আইপীসের জোড়া মিলিয়ে নানা রকমের ম্যাগনিফাইং পাওয়ার করে নেওয়া যায়। ধরো, তিনটে করে অবজেক্টিভ দিয়েছে 4,8,15 প্রাথমিক পরিবর্ধনের,

আর আইপীস দিয়েছে 5, 10, 20, শক্তির। এ দিয়ে মাইক্রোস্কোপের সবচেয়ে কম পরিবর্ধন শক্তি হবে $4 \times 5 = 20$ এবং এবং সবচেয়ে হবে $15 \times 20 = 300$; মাঝামাঝি শক্তি পাবে, যেমন, $8 \times 5 = 40$, $8 \times 10 = 80$ $15 \times 10 = 150$, ইত্যাদি।

বলেছি, অবজেক্ট লেন্সের ফোকাল লেংথ যতো ছোটো হয়, প্রাথমিক পরিবর্ধন ততো বেশি হয়। মোটামুটি বলতে গেলে, নলের দৈর্ঘ্যকে অবজেক্ট লেন্সের ফোকাল লেংথ দিয়ে ভাগ করলে প্রাথমিক পরিবর্ধন পাওয়া যায়। নলের দৈর্ঘ্য যদি 5 ইঞ্চি হয় আর অবজেক্ট লেন্সের ফোকাল লেংথ যদি $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি হয় তাহলে প্রাথমিক পরিবর্ধন হবে দশ : $5 \div \frac{1}{2} = 10$.

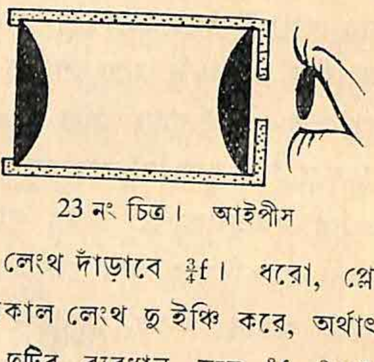
মাইক্রোস্কোপের নিচেই থাকে স্টেজ (stage) বা পাটা, যার ওপর কাচের শ্লাইডে খুদে জিনিসের নমুনা (specimen) ধরা হয়। এবার মাইক্রস্কোপ উঠিয়ে নামিয়ে ফোকাস করতে হয় যতক্ষণ না পরিষ্কার ছবি দেখা যায়। স্টেজের নিচে একটা ছোট্ট আয়না থাকে, সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলো ফেলা হয় শ্লাইডে, যাতে ভালো করে দেখা যায়। অনেক সময় ছোট্ট চোঙের মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক লাইটও দেওয়া থাকে, আলো ফেলবার জন্য।

মাইক্রোস্কোপের অবজেক্ট লেন্সটা যুগ্ম বা অ্যাক্রোম্যাটিক হয়। যুগ্মলেন্সটা প্লেনো কনভেক্স—প্লেন দিকটা নলের বাইরে আর গোল পিঠটা নলের ভেতরের দিকে থাকে।

আইপীস সম্বন্ধে একটু বলি। র‍্যামস্‌ডেন আইপীস

(Ramsden eyepiece) তৈরি করা সহজ, অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স দরকার হয় না, সরল লেন্স দিয়ে তৈরি করা যায়। এরকম আইপীস মাইক্রোস্কোপ ও টেলিস্কোপ—দুটোতেই ব্যবহার করা চলে।

র‍্যামসডেন আইপীস তৈরি করতে দুটো সমান ফোকাল লেংথএর প্লেনো কনভেক্স দরকার হয়। দুটোরই প্লেন দিক আইপীস নলের বাইরের দিকে মুখ করা থাকবে। দুটো লেন্সের ব্যবধান হবে $\frac{2}{3}$f; এখানে f মানে এক একটি লেন্সের ফোকাল লেংথ। তার ফলে আইপীসের মোটের-



23 নং চিত্র। আইপীস

ওপর ফোকাল লেংথ দাঁড়াবে $\frac{3}{4}$f। ধরো, প্লেনো কনভেক্স লেন্স দুটির ফোকাল লেংথ দু ইঞ্চি করে, অর্থাৎ f=2 ইঞ্চি। তাহলে লেন্স দুটির ব্যবধান হবে $\frac{2}{3}f=\frac{2}{3}\times 2=1\frac{1}{3}$ ইঞ্চি। আইপীসের ফোকাল লেংথ দাঁড়াবে $\frac{3}{4}f=\frac{3}{4}\times 2=1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। এইভাবে র‍্যামস্‌ডেন আইপীসের হিসাব হবে। তাহলে এই আইপীসটার পরিবর্ধন শক্তি কত হলো? পরিবর্ধন শক্তি হলো, $10\div 1\frac{1}{2}=6\frac{2}{3}$ গুণ।

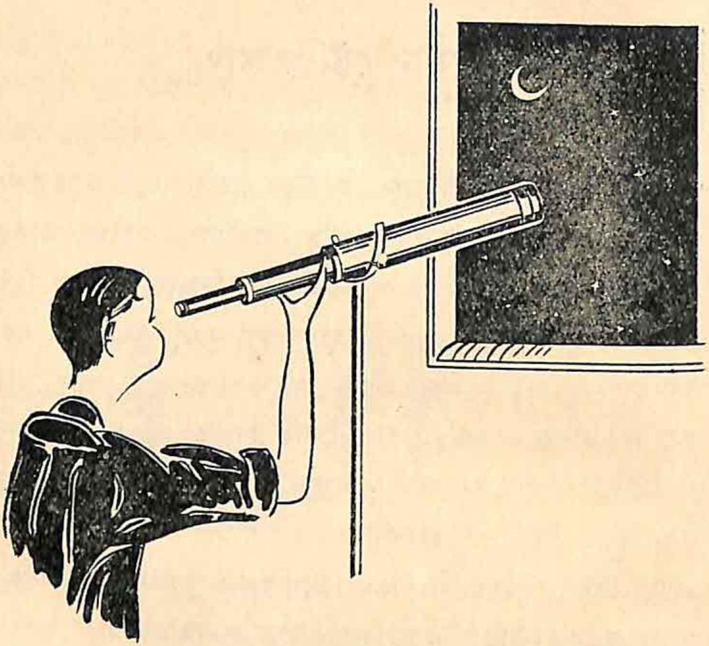
অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স দেওয়া আইপীস হয়। সেগুলি আরো ভালো।

॥ নয় ॥

দূরবীন টেলিস্কোপ

গ্যালিলিও 1609 খ্রীষ্টাব্দে দূরবীন তৈরি করে আকাশের জ্যোতিষ্ক (গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি) পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করেন নি। এরও প্রায় তিনশ বছর আগে হল্যাণ্ডে, ভেনিসে এবং ইউরোপের আরো নানা দেশে লোকেরা চশমার লেন্স তৈরি করতে আরম্ভ করে। তারা তৈরি করতো বুড়ো মানুষদের লংসাইটের জন্য কনভেক্স লেন্সের চশমা। ক্রমশ চশমার কাচ দিয়ে দূরবীন তৈরির পদ্ধতি তাদের মাথায় এলো। 1608 খ্রীষ্টাব্দে লিপার্সি (Jan Lippershey) নামে একজন ওলন্দাজ চশমাকারক একটা কন্‌ভেক্স চশমার লেন্সের পেছনে আর একটা কনকেভ লেন্স বসিয়ে 'দূরের জিনিস কাছে দেখবার যন্ত্র তৈরি করলেন। এটাই হলো দূরবীনের গোড়াপত্তন। লিপার্সি একটা কাগজের নল তৈরি করলেন, কাঠের গোল ডাণ্ডার ওপর আঠা-বার্নিশ-লাগানো কাগজ জড়িয়ে জড়িয়ে। আঠা-বার্নিশ শুকিয়ে গেলে ডাণ্ডাটা বার করে নিলেন। এই হলো দূরবীনের চোং। সামনে দিলেন দেড়ফুট ফোকাসের চশমার কনভেক্স লেন্স, পিছনে দিলেন ছ ইঞ্চি ফোকাসের

কনকেভ লেন্স। এই দূরবীন দিয়ে দূরের জিনিস তিন গুণ বড়ো হয়ে দেখতো লাগলো।

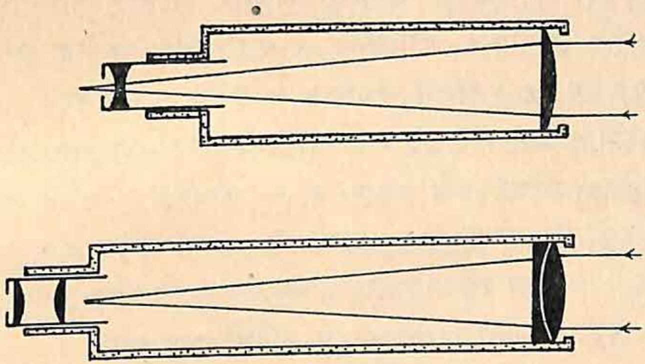


24 নং চিত্র। দূরবীন

গ্যালিলিও ঐ ভাবেই নিজের দূরবীন তৈরি করলেন। কিন্তু তিনি আরো ভালো লেন্স তৈরি করে দূরবীনের উন্নতি করলেন। শুধু তাই নয়, গ্যালিলিও অন্যান্য চশমাকারকদের মতো হাতুড়ে বিদ্যে দিয়ে করলেন না। তিনি দূরবীনের মধ্য দিয়ে আলো চলাচলের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বুঝে নিলেন। তার ফলে তিনি আরো শক্তিশালী দূরবীন তৈরি করতে

পারলেন। এর পর তিনি একটা দূরবীন তৈরি করলেন যেটা দিয়ে দূরের জিনিস বত্রিশগুণ বড়ো হয়ে দেখাতে লাগলো।

লিপার্সি বা গ্যালিলিও দূরবীণের আইপীসে কনকেভ লেন্স ব্যবহার করলেন। এ ধরনের দূরবীন এখনও চলে, বিশেষত শস্তার বাইনোকুলার, ফিল্ড গ্লাস বা অপেরা গ্লাসে এরকম দেখবে। সামনে কন্‌ভেক্স লেন্স, চোখের কাছে



25 নং চিত্র। দূরবীণ (ওপরে) গ্যালিলিও জাতীয়।
(নীচে) কেপ্‌লার জাতীয়।

কনকেভ লেন্সের আইপীস। এই ধরনের দূরবীন "গ্যালিলিও টেলিস্কোপ" নামে পরিচিত। কিন্তু আজকাল ভালো দূরবীনে বা বাইনোকুলারে কনকেভ আইপীস ব্যবহার করা হয় না, কনভেক্স লেন্সের আইপীস দেয়। দূরবীনে কনভেক্স আইপীসের ব্যবহার প্রবর্তন করেন আর-এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, তাঁর নাম কেপলার (Johann Kepler)।

দূরবীনের সামনের কনভেক্স লেন্সটাকে বলে অবজেক্ট গ্লাস। এই কনভেক্স অবজেক্ট গ্লাস দিয়ে দূরের বস্তুর ছবি পড়ে দূরবীনের নলের মধ্যে (যেমন ক্যামেরায় ছবি পড়ে), সেই ছবিই আইপীস দিয়ে বড়ো করে দেখা হয়। কনকেভ আইপীস দিলে ঐ ছবির আগে আইপীসটা বসবে। কনভেক্স আইপীস দিলে ঐ ছবির পিছনে আইপীসটা বসবে। 25 নম্বর ছবিতে উদাহরণ দেখো।

ছোটো দূরবীন সম্পর্কে আগেই বলেছি গ্যালিলিও শ্রেণীর দূরবীনের কী সুবিধা। গ্যালিলিও শ্রেণীর দূরবীন মানে যে-সব দূরবীনে কনকেভ আইপীস দেওয়া হয়। এর প্রধান সুবিধে, অবজেক্ট গ্লাস অ্যাক্রোম্যাটিক না হলেও বিশেষ রঙচঙে অস্পষ্ট ছবি দেখায় না। তাছাড়া, এর মধ্য দিয়ে ছবি উল্টো দেখায় না, সোজা দেখা যায়। কিন্তু এ জাতের দূরবীনের অসুবিধা এই যে একসঙ্গে অল্প জায়গা দেখা যায় —অর্থাৎ field of view বা দৃষ্টিপরিসর ছোটো হয়। এ ধরনের দূরবীন বেশি শক্তিশালী করা যায় না।

আইপীসে কনভেক্স লেন্স দিলে field of view বাড়ে, অর্থাৎ দৃষ্টিপথে অনেকটা জায়গা একত্রে দেখতে পাওয়া যায়। এটা হ'লো কেপলার জাতের টেলিস্কোপ। এ রকন দূরবীনে অবজেক্ট লেন্সটি অ্যাক্রোম্যাটিক হওয়া বিশেষ দরকার।

দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি বা magnifying power কী করে ঠিক করবে বলছি। সামনের অবজেক্ট লেন্সের ফোকাল লেংথকে আইপীসের ফোকাল লেংথ দিয়ে ভাগ করলে যে

সংখ্যা পাওয়া যায় সেটাই হলো দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি। মনে করো অবজেক্ট লেন্সের ফোকাল লেংথ 20 ইঞ্চি, আইপীসের 2 ইঞ্চি। তাহলে দূরবীনের শক্তি হলো $20 \div 2 - 10$ (দশ)। আইপীসের ফোকাল লেংথ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি দিলে দূরবীনটার পরিবর্ধন শক্তি হবে $20 \div \frac{1}{2} = 40$ (চল্লিশ)। অর্থাৎ শুধু আইপীস বদলে বদলে দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি কমবেশি করা যেতে পারে।

আইপীসের ফোকাল লেংথ কমিয়ে দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি যতো খুশি বাড়ানো যেতে পারে। কথাটা এক হিসাবে ঠিক, কিন্তু যতো খুশি পরিবর্ধন শক্তি বাড়িয়ে খুব লাভ হয় না। দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি যতো বাড়াবে ছবির আলোর জোর ততো কমে যাবে, দেখতে আরাম পাবে না। পরিবর্ধন শক্তি বাড়ালে দূরবীনের দৃষ্টিপরিসর (field of view) ছোটো হয়ে যায় অর্থাৎ দূরবীনের মধ্য দিয়ে অল্প একটু জায়গা দেখা যায়। আর একটা অসুবিধা, হাতে ধরে দেখবার জো থাকবে না, একটুতেই খুব নড়ছে মনে হবে। অবশ্য স্ট্যাণ্ডে বসিয়ে দেখলে অন্য কথা। সাধারণত বাইনোকুলারের ম্যাগনিফিকেশন 4 থেকে 6 পর্যন্ত হয়। আট বা দশও হয় কদাচিৎ। হাতে-ধরা দূরবীনের ম্যাগনিফিকেশন দশের বেশি করা ঠিক না। স্ট্যাণ্ডে বসিয়ে দেখলে আরো বেশি ম্যাগনিফিকেশন বাড়ানো যেতে পারে।

অন্যান্য বিচারে দেখা যায় দূরবীনের সর্বোচ্চ পরিবর্ধন শক্তি (maximum magnification) অবজেক্ট লেন্সের

আকারের ওপর নির্ভর করে। অবজেক্ট লেন্সের আকার বলতে ব্যাস (diameter) বোঝায়। অবজেক্ট গ্ল্যাসের প্রতি ইঞ্চিতে 25 বা 30 করে সর্ব্বোচ্চ শক্তি ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ এক ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনে 25-এর বেশি ম্যাগনিফিকেশন করা উচিত হবে না, দু-ইঞ্চি ব্যাসের হলে 50 এর বেশি করা উচিত হ'বে না, চার ইঞ্চিতে 100-র বেশি না, ছ ইঞ্চি ব্যাসের অবজেক্ট গ্লাস ১৫০-র বেশি না—এই রকম।

আসলে অবজেক্ট গ্লাস যতো বড়ো হবে দূরবীনের জোর ততো বাড়বে। কারণ অবজেক্ট গ্লাস বড়ো হলে আলো বেশি জড়ো করবে, ভালো করে দেখা যাবে, বেশি ম্যাগনিফিকেশন দেওয়া যাবে, ইত্যাদি। কোন্ দূরবীন কতো শক্তিশালী তা জানতে হলে শুধু বলতে হয় অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস কতো। বলা হয় 'ছ ইঞ্চি টেলিস্কোপ'। তার মানে কিন্তু দূরবীনটি ছ ইঞ্চি লম্বা নয়। ছ ইঞ্চি টেলিস্কোপ মানে তার অবজেক্ট গ্লাসটির ব্যাস ছ ইঞ্চি। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের দূরবীনটি সাত ইঞ্চি দূরবীন, অর্থাৎ লেন্সটি সাত ইঞ্চি ব্যাসের। দক্ষিণ ভারতে কোডাই কানালে যে মানমন্দির (observatory) আছে তার দূরবীনটি একুশ ইঞ্চি। অর্থাৎ সামনের অবজেক্ট লেন্সটির ব্যাস একুশ ইঞ্চি। আমেরিকার ইয়ার্কেস মানমন্দিরে চল্লিশ ইঞ্চি ব্যসের লেন্স-ওয়ালা দূররীন। চল্লিশ ইঞ্চি মানে তিন ফুট চার ইঞ্চি, প্রায় আড়াই হাত! এতো বড় একটা অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স কী বিরাট ব্যাপার বলো তো! কিন্তু এই

কি শেষ? আমেরিকার মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের দূরবীনটি একশ ইঞ্চির। অবজেক্ট গ্লাসটির ব্যাস ১০০ ইঞ্চি বা আট ফুট চার ইঞ্চি। তবে এটা লেন্স নয়, কনকেভ আয়না। কনকেভ আয়না দিয়ে কী করে দূরবীন তৈরি করা যায়; এবং তার সুবিধা কী, সেকথা পরের অধ্যায়ে বলবো। আমেরিকাতেই কয়েক বছর হলো আর একটা এইরকম দূরবীন তৈরি হয়েছে সেটার ব্যাস ২০০ ইঞ্চি, অর্থাৎ ষোল ফুট আট ইঞ্চি। এই আয়নাব কাচটিব্র ওজন প্রায় পনেরো টন। এটাই হলো এখন পৃথিবী মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও শক্তিশালী দূরবীন।

লেন্সের ব্যাস যতোগুণ বড়ো হবে তার আলো ধরবার ক্ষমতা তার বর্গগুণ বেশি হবে। অর্থাৎ, একটা এক ইঞ্চি ব্যাসের অবজেক্ট গ্লাস যতটা আলো জড়ো করবে, একটা চার ইঞ্চি ব্যাসের অবজেক্ট গ্লাস তার ষোলোগুণ আলো জড়ো করবে। ব্যাস 4 গুণ বলে আলো ধরবার ক্ষমতা হলো তার বর্গগুণ, অর্থাৎ $(4)^2 = 4 \times 4 = 16$ গুণ। তেমনি, একটা দেড় ইঞ্চি অবজেক্ট লেন্স যত আলো ধরবে, একটা ন ইঞ্চি ব্যাসের লেন্স তার ছত্রিশ গুণ আলো ধরবে। কারণ, দেড় ইঞ্চির তুলনায় ন ইঞ্চি হলো ছ গুণ, আলো জড়ো করবে, বর্গগুণ অর্থাৎ $(6)^2 = 6 \times 6 = 36$ গুণ।

খালি চোখে দেখবার সময় অল্প আলো চোখের মধ্যে ঢোকে। চোখের তারার মধ্যে তারারন্ধ্র বা মণি, এর মধ্য দিয়েই চোখের মধ্যে আলো ঢোকে। চোখের মণি বা তারারন্ধ্রের ব্যাস ধরো এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ। এবার মনে করো একটা

দূরবীন নিয়েছো যেটার অবজেক্ট গ্লাস দেড় ইঞ্চি ব্যাসের, অর্থাৎ চোখের মণির 15 গুণ। তাহলে ঐ দূরবীন খালি চোখের তুলনায় $15^2 = 15 \times 15 = 225$ গুণ আলো জড়ো করে চোখকে সাহায্য করবে। এই কারণে সন্ধ্যার আবছা আলোতেও দূরের জিনিস দূরবীন দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। রাতের আকাশে খালি চোখে যেখানে তারা দেখা যায় না, মনে হয় শুধু ফাঁকা অন্ধকার, সেখানে দূরবীন ফিরিয়ে দেখো কতো তারা ঝিকমিক করছে। কারণ একই। খুব দূরের তারা,—তাদের আলো এসে পৌঁছায় এত অল্প যে খালি চোখে নজরে আসে না। যেই দূরবীন চোখে লাগালে অমনি ঐ ক্ষীণ তারার আলো দুশো গুণ হয়ে জড়ো হলো, তাই দেখতে পেলে।

শুধু কি তাই? বৃহস্পতি গ্রহ দেখেছো? জ্বলজ্বলে বড়ো তারার মতো। এবার তোমার দূরবীনটি দিয়ে দেখো। ওকি, ওর পাশে চারটি ছোট্ট ছোট্ট তারার মতো কী চিক চিক করছে? ঠিক বলেছো। বৃহস্পতি [Jupiter] গ্রহের দশটি উপগ্রহ বা চাঁদ আছে, এরা বৃহস্পতি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে, আমাদের চাঁদ যেমন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতির দশটি চাঁদের মধ্যে চারটি বড়ো, তাদেরই তুমি তোমার হাতে গড়া দূরবীন দিয়ে দেখতে পাচ্ছো।

এবার দূরবীনটা আমাদের চাঁদের দিকে ফেরাও। কী কাণ্ড! এবড়োখেবড়ো ওগুলি কী চাঁদের পিঠে! এগুলি চাঁদের পিঠে পাহাড়, তাই এবড়োখেবড়ো দেখাচ্ছে, আর পাহাড়ের ছায়া দেখাচ্ছে আবছা অন্ধকার।

এখন বলি কী করে দূরবীন তৈরি করবে।

প্রথমেই যদি লেন্স তৈরি করতে না চাও তো লেন্স জোগাড় করো। একটা প্লাস দুই পাওয়ারের চশমার লেন্স শস্তা দরে কিনে নাও। প্লাস পাওয়ারের চশমা মানে কনভেক্স লেন্স। দুই পাওয়ার হলে ফোকাল লেংথ হবে 20 ইঞ্চির মতো। চশমার গোল কাচের ব্যাস হবে দেড় ইঞ্চির মতো। ঐ মাপের একটা কার্ডবোর্ডের বা টিনের নল তৈরি করো। নলের সামনে চশমার লেন্সটা লাগিয়ে দাও। নলের মধ্যে, লেন্সের সামনে পিছনে কার্ডবোর্ডের মোটা করে রিঙ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিলে কাচটা পড়ে যাবার ভয় থাকবে না। নলের অন্য মুখে আর একটা ছোটো নল ঢোকাও, তার মধ্যে 4 ইঞ্চি ফোকাল লেংথএর একটা কনকেভ লেন্স লাগিয়ে নাও। এটা হবে আইপীস।

আইপীসের লেন্সটা বড়ো হবার দরকার নেই, আধ ইঞ্চি ব্যাসের হলেই চলবে। বড়ো নলটা হবে পনেরো ইঞ্চির মতো লম্বা, ছোটো নলটা তিন-চার ইঞ্চি হবে। দুটো লেন্সই পরিষ্কার রাখবে। আঠা লেগে গেলে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নেবে।

দূরবীন প্রস্তুত। এর মধ্য দিয়ে দেখো। নল দুটো টেনে ঠেলে ফোকাস ঠিক করে নাও। এই দূরবীন দিয়ে সব পাঁচ গুণ বড়ো দেখাবে। কারণ অবজেক্ট লেন্সের ফোকাল লেংথ 20 ইঞ্চি, আইপীসের ফোকাল লেংথ 4 ইঞ্চি। দূরবীনের পরিবর্ধন-শক্তি তাহলে $20 \div 4 = 5$ গুণ।

॥ দশ ॥

প্রতিফলক দূরবীন তৈরির মজা

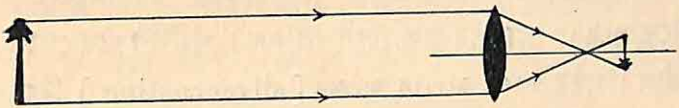
লেন্স দিয়ে দূরবীন তৈরি করতে শিখলে। এই ধরনের দূরবীন খুব বড়ো বা শক্তিশালী করবার পথে কয়েকটি বাধা আছে। অবজেক্ট লেন্স যদি অ্যাক্রোম্যাটিক না হয় তাহলে পাঁচ-সাত ম্যাগনিফিকেশনের বেশি বাড়াতে গেলে ছবিতে নানা রকম দোষ আসবে। প্রধান দোষ হবে বর্ণাপেরণের জন্য রঙচঙে অস্পষ্ট ছবি। লেন্স তৈরি করতে শিখেছো; নানা আকারের নানা ফোকাল লেংথএর লেন্স তৈরি করতে পারবে কিন্তু অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স তৈরি করতে দু জাতের কাচ লাগবে আর শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে হিসাব করতে হবে। এখনই ও সব হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।

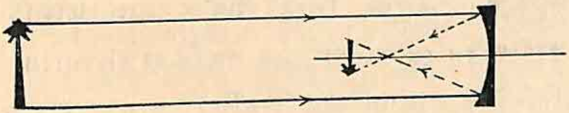
অন্য উপায় আছে। খুব ভালো আর সহজ উপায়। নিউটন এই উপায় আবিষ্কার করেন। অবজেক্ট লেন্সের বদলে তিনি ব্যবহার করলেন অবজেক্ট মিরর (object mirror) বা প্রতিফলক। এই জাতের দূরবীনকে বলে প্রতিফলক দূরবীন (reflecting telescope) বা নিউটনীয় দূরবীন।

কনভেক্স লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে যেমন লেন্সের পিছনে ছবি পড়ে, কনকেভ আয়নার আলো প্রতিফলিত

হয়ে আয়নার সামনে তেমনি ছবি পড়ে। তার পর যথাস্থানে আইপীস লাগিয়ে দূরবীন তৈরি করে নিলেই হলো।

দূরবীনের উপযোগী কনকেভ আয়না কী করে তৈরি করতে হয় বলছি। কিন্তু তার আগে বলি এরকম প্রতিফলক দূরবীনের কী কী সুবিধা। প্রধান সুবিধা এই যে, প্রতিফলক আয়না দিয়ে যে ছবি সৃষ্টি হয় তাতে কোনোরকম বর্ণাপেরণ দোষ থাকে না, ছবি হয় একেবারে পরিষ্কার নিখুঁত ঝকঝকে।





26 নং চিত্র। কনভেক্স লেন্স ও কনকেভ আয়না দিয়ে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি

দূরবীনের আয়না যথেষ্ট বড়ো করা যায়। পাঁচ বা ছ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন প্রতিফলক তৈরি করা তোমাদের কাছে খুব শক্ত লাগবে না। কোনো যন্ত্রপাতিও লাগবে না।

আমরা একটা ছ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন-আয়না তৈরি করবো। এই দূরবীনে 50 থেকে 100 ম্যাগনিফিকেশন সহজেই করা যাবে। কী বড়ো আর স্পষ্ট ছবি দেখতে পাবে এর মধ্য দিয়ে! কিন্তু মনেরখো,দূ রেবীনের চোঙ চার-ফুট-মতো লম্বা

হবে, সাত-আট ইঞ্চি মোটা। বেশ ভারী হবে। এর জন্য স্ট্যাণ্ড তৈরি করতে হবে শক্ত দেখে। কিন্তু জিনিসটা হবে চমৎকার। এমন একটা দূরবীন তৈরি করতে পারলে পাড়ার ছেলেবুড়ো সবাই আসবে দেখতে। স্কুল-কলেজের বন্ধুবান্ধবরাও ছাড়বে না। মাস্টার মশাইরাও আসবেন, আর তোমাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে যাবেন।

মোটা কাচের চাক্তিকে কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো দিয়ে ঘসে তাওয়ার মতো কনকেভ ডৌল [concave curvature] দিতে হবে। তারপর রুজ দিয়ে পালিশ। পালিশ হয়ে গেলে ডৌল পিঠের ওপর রুপোর আস্তর [silver coating] দিতে হবে, রাসায়নিক প্রথায়। কাচের চাক্তির ওপর নিখুঁত ডৌল তুলতে পারলেই রুপোর ঝকঝকে আস্তরটা নিখুঁত ছবি স্থষ্টি করতে পারবে। কাচের পিঠে নিখুঁত ডৌল তোলাই হল আসল কারিগরি। রৌপ্য পাতনের পদ্ধতি বা silvering process পরিশিষ্টতে আলাদা করে দিয়েছি। দোকান থেকেও সিলভার করিয়ে নেওয়া যায়। আসল হলো কাচের পিঠে গ্রাইণ্ড ও পালিশ করে নিখুঁত ডৌল তোলা। সে কথাই বলি।

ছ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন আয়না তৈরি করতে ঐ মাপের ছুটো কাচের চাক্তি লাগবে। মোটা কাচ চাই। একটি চাক্তি হবে এক ইঞ্চি মোটা, অন্যটা আধ ইঞ্চি মোটা হলে চলবে। এ-জাতীয় প্লেট-গ্লাসের চাদর কোথায় কিনতে পাওয়া যায় আগে বলেছি।

দুটো ছ ইঞ্চি চাক্তির মধ্যে যেটা বেশি মোটা (1 ইঞ্চি, না হলে $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি) সেটা হবে দূরবীনের আয়না। অন্য চাকাটা কী হবে? সেটা হবে ঘষে ডৌল তোলবার যন্ত্র, grinding tool। পাতলা কাচের চাকাটা থাকবে নিচে, মোটা চাকাটার ওপরে, মধ্যে কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো আর জল। এই ভাবে গ্রাইণ্ড করতে হবে। দুটোই চ্যাটালো (flat) কাচের চাক্তি, অথচ এইভাবে ঘষলে এক অভাবনীয় কাণ্ড হবে। ওপরের হাতের কাচটা হয়ে দাঁড়াবে কনকেভ, নিচেরটা কনভেক্স। তাহলে হাতের কাচটা হবে দূরবীন আয়নার উপযোগী।

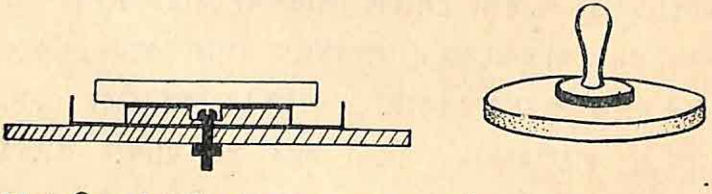
কী করে এরকম হয় সে কথা ক্রমে ক্রমে বলছি। কী কী করতে হবে, গোড়া থেকে শুরু করি।

দোকানে যখন মোটা কাচের চাকা কিনবে, দোকানদার কাচের চাদর থেকে মোটামুটি গোল করে কেটে দেবে। কিনার হবে এবড়োখেবড়ো। যদি কিছু বেশি পয়সা দাও তো ওরাই ঘসে edge করে দেবে, অর্থাৎ ধার ঘষে পরিষ্কার গোল চাকা তৈরি করে দেবে। না হলে নিজে করে নিতে হবে। খুব শক্ত নয়, তবে সময় লাগে। একটা দু-ইঞ্চির মতো চওড়া পাতলা লোহার পাত বা মোটা টিনের পাত নাও, লম্বায় হাতখানেক। পাতটাকে গোল করে বেঁকিয়ে নাও যাতে কাচের চাকাটা ঢোকালে চারদিক দিয়ে চেপে ধরে। কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো আর জল মাখিয়ে কাচের চাকাটা এর মধ্যে ঘোরালে এবড়োখেবড়ো ধারটা ক্রমশ ক্ষয়ে সমান হয়ে আসবে। কাজের সুবিধার জন্য লোহার

বাঁকানো পাতের এক দিকটা একটা কাঠের পাটার সঙ্গে পেরেক দিয়ে লাগিয়ে নাও, যাতে কাঠের পাটাটা বঁটির মতো পা দিয়ে ধরে বসতে পারো। মোটা দানার কার্বোরাণ্ডাম আর জল দিয়ে কাচের চাকাটা বাঁকানো লোহার পাতের মধ্যে ঘোরাতে হবে, গুঁড়ো কমে গেলে বারবার দিতে হবে। একটা চাকার ধার ঘষা শেষ হলে অন্যটাও করতে হবে।

দোকান থেকে edge করিয়ে নাও বা নিজেই করো, এর পরে কাচের চাকা দুটোর ধারালো পরিধি ঘষে ভোঁতা করে নিতে হবে। একে বলে bevel করা। এটা সহজেই করা যায়। একটা টিনের চটা নাও। কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো আর জল মাখিয়ে পরিধি ধরে ঘষে যাও। পরিধি [circumference] ভোঁতা করে না নিলে অসাবধানে ঠোক্কর লাগলে চড়াং করে কাচের চটা উঠে যাবে।

দূরবীন আয়না গ্রাইণ্ড করবার আগে কাচের চাকা দুটোকে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে : পাতলা চাকাটা লাগাতে হবে একটা কাঠের পাটার ওপর, আর মোটা চাকাটার এক পিঠে একটা কাঠের হ্যাণ্ডেল লাগাতে হবে।

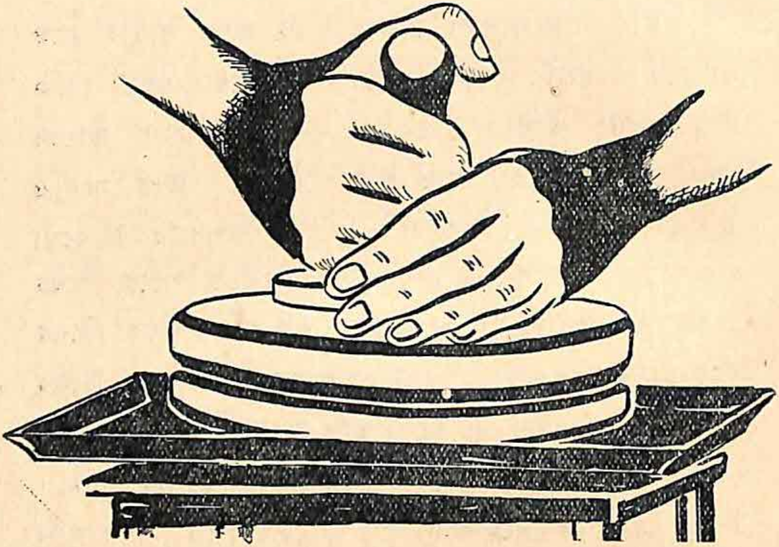


27 নং চিত্র। (ডানদিকে) হাতল-লাগানো দূরবীন আয়নার কাচ।
(বাঁদিকে) কাঠের পাটা, টিনের ট্রে ও ঘষবার কাচের চাকা।

প্রথমে বলি পাতলা চাকাটা কী করে পাটার সঙ্গে লাগাবে। একটা কাঠের পাটা নাও, মধ্যে একটা সিকি ইঞ্চি ফুটো করো। একটা 4-ইঞ্চি ব্যাসের কাঠের চাকা তৈরি করো, আধ ইঞ্চি মোটা। তার মধ্যেও ঐ রকম একটা ফুটো করো। ফুটোর ওপর দিকটা বড়ো হবে যাতে একটা বল্টুর মাথা ঢুকে থাকতে পারে, অথচ একেবারে গলে না যায়। একটা এক-হাত চৌকো টিনের টুকরো নাও, এরও মাঝে বল্টু যাবার ফুটো করো, টিনের চারধার একটু মুড়ে ট্রের মতো করে নাও। প্রথমে কাঠের পাটার ওপর টিনের ট্রে রাখো, তার ওপর কাঠের চাকা। এবার তিনটাকে নিয়ে বল্টু দিয়ে এঁটে দাও। যখন খুশি খুলতেও পারবে। কাঠের পাটা একটা উঁচু টুল বা প্যাকিং বাক্স বা ঐ রকম একটা কিছুর ওপর বসাও। মাটি থেকে আড়াই ফুট আন্দাজ উঁচু হলেই হলো। এবার কাঠের চাকার ওপর পিচ গলিয়ে পুরু করে লাগিয়ে দাও। পিচ গরম থাকতে থাকতে পাতলা আধ ইঞ্চি মোটা কাচের চাক্তিটা সেন্টার করে লাগিয়ে দাও। 27 নং ছবি দেখো।

এবার মোটা কাচটা নাও। কাঠের-চাকা-ওয়ালা হ্যাণ্ডেলটা এর পিঠে পিচ গলিয়ে লাগিয়ে দাও। ছবিতে দেখো।

সমস্ত প্রস্তুত। এবার মোটা দানার কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো পাটার কাচের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে জল দাও। হ্যাণ্ডেল-লাগানো মোটা কাচের চাকাটা এর ওপর ঘষতে থাকো। ঘষবার



28 নং চিত্র। কার্বোরাণ্ডাম দিয়ে ঘষলে ওপরের কাচের চাকাটা কনকেভ হবে, সেটাই হবে দূরবীনের আয়না। (Mirror grinding)

একটা পদ্ধতি বা নিয়ম আছে। ওপরের কাচটার ওপর সমান সমান রেখে এমন ভাবে ঠেলবে ও টানবে যাতে এই আগে পাছে [to and fro] ঘষবার সময় ওপরের কাচটা প্রায় অর্ধেক করে বেরিয়ে যায়। এরকম আগে-পাছে ঘষাকে বলে ষ্ট্রোক [stroke]। দ্বিতীয় কর্তব্য : আগে-পাছে ঘষার মাঝে একটু করে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দেবে। তৃতীয় কর্তব্য : সঙ্গে সঙ্গে তুমি পাটার চারিদিক দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে। ভাবছ, কী গোলমেলে ব্যাপার। মোটেই না, আরম্ভ করে দেখো।

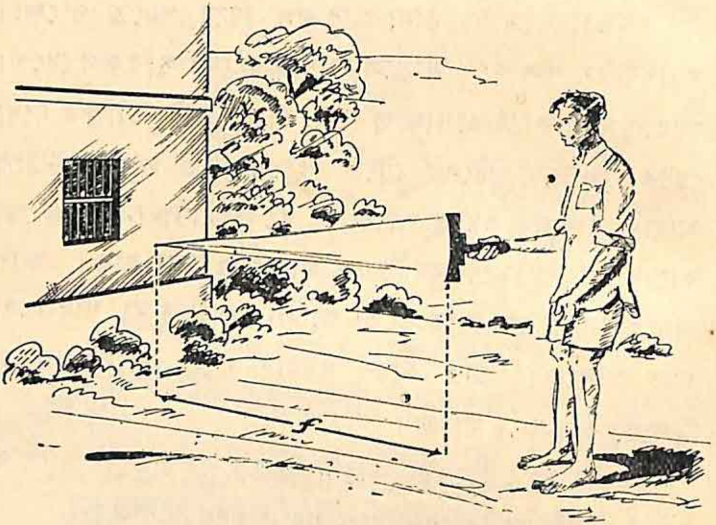
এইভাবে মোটা দানা আর জল দিয়ে ঘষতে থাকো। ঘ্যাঁসঘ্যাঁস শব্দ কমে আসলে আবার গুঁড়ো আর জল দেবে। ঘষবার সময় কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ো কাচের দুই চাক্তির মধ্যে থেকে বেরিয়ে টিনের ট্রেতে পড়বে। ঐ গুঁড়ো উঠিয়ে আবার ব্যবহার করতে পারো। তবে মোটাদানার গুঁড়ো কাচের চাক্তির মধ্যে ঘষা খেয়ে আরো গুঁড়িয়ে যায়। আর দেখবে ঘষা গুঁড়ো আর ততো কালো দেখাচ্ছে না, সাদাসাদা হয়ে আসছে। তার কারণ ঘষবার ফলে কাচের গুঁড়ো মিশছে, কাচ ক্ষয়ে যাচ্ছে।

ঘষবার সময় হাতের কাচটা একটু একটু করে ঘোরাতে ভুলো না, নিজেকেও চারিদিকে ঘুরতে হবে সেই সঙ্গে।

আধঘণ্টা এই ভাবে গ্রাইণ্ড করলেই বুঝতে পারবে হাতের কাচটা তাওয়ার মতো কনকেভ ডৌল নিয়েছে। জলে ধুয়ে একটা সোজা কাঠি বা স্কেল ফেলে দেখো কাচের চাক্তিটার মাঝামাঝি। স্কেলটা কাচের দুই সীমায় ঠেকছে, মধ্যে ঠেকছে-না। অর্থাৎ মধ্যেটা তাওয়ার মতো হয়েছে। এবার স্কেলটা পাটার কাচের ওপর ধরে দেখো, মধ্যেটা উচু অর্থাৎ কনভেক্স। তবে, দেখবে ডৌল খুব সামান্যই। যতো বেশিক্ষণ ধরে ঘষবে, ডৌল ততোই বাড়তে থাকবে।

হাতের কাচটা কনকেভ হচ্ছে। এটাই হবে দূরবীনের কনকেভ আয়না।

আধঘণ্টা ধরে মোটা কার্বো দানা দিয়ে ঘষবার পরে কৌতূহল হবে, ফোকাল লেংথ কতো হলো। সত্যিই সেটা



29 নং চিত্র। সূর্যের আলো দেয়ালে ফোকাস করে ফোকাল লেংথ মেপে নাও।

দেখে নেওয়া দরকার। হাতের চাক্তিটাকে এবার থেকে আয়না বা প্রতিফলক বলবো। ফোকাল লেংথ দেখবার জন্য আয়নাটাকে ধুয়ে নাও। ভিজে থাকতে থাকতে রোদে নিয়ে গিয়ে সূর্যকে দেয়ালে ফোকাস করো। দেয়াল থেকে কাছে দূরে সরে যখন সবচেয়ে ছোটো আর সবচেয়ে উজ্জ্বল ফোকাস পাবে, তখন আয়না থেকে সূর্যের ফোকাস অবধি হলো ফোকাল লেংথ।

ছ ইঞ্চি আয়নার পক্ষে চারফুট ফোকাল লেংথ হওয়া ভালো। মোটা দানার রাফ গ্রাইণ্ডে পাঁচফুট মতো ফোকাল লেংথ এলে রাফ গ্রাইণ্ডিং বন্ধ করবে। মনে রেখো, রাফ

গ্রাইণ্ডিংএর সময় এভাবে ফোকাল লেংথ মাপতে একটু অসুবিধা হবে। প্রথম অসুবিধা, সূর্যের ফোকাস খুব পরিষ্কার ভাবে দেয়ালে পড়বে না। আর, ঘষা আয়না শুকিয়ে এলে দেয়ালে ফোকাস পড়বে না। তখন ঘষা মুখটা আবার জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। যাই হোক, মোটামুটি পাঁচফুট মতো ফোকাস এলো কিনা বুঝতে খুব কষ্ট হবে না। যতোক্ষণ পাঁচফুট আন্দাজ ফোকাল লেংথ না আসে ততোক্ষণ রাফ গ্রাইণ্ডিং চালিয়ে যাও, আর মধ্যে মধ্যে ঐ ভাবে ফোকাল লেংথ দেখে নাও। গোড়ার দিকে হয়তো দশ-বারো ফুট ফোকাল লেংথ দেখবে। আর খানিকক্ষণ গ্রাইণ্ডিং চালালে, তার চেয়ে একটু ছোটো হবে। আরো খানিকক্ষণ ঘষলে, আরো ছোটো হবে। এই ভাবে পাঁচফুট মতো ফোকাল লেংথ দাঁড়ালে মোটা দানার ঘষা বন্ধ করবে।

এবার কাচ, পাটা, হ্যাণ্ডেল সব ভালো করে ধুয়ে ফেলে মাঝারি দানার কার্বোরাণ্ডাম দিয়ে ঠিক ঐভাবে ঘষতে থাকো, ঘুরে ঘুরে। জল যেন কখনো শুকিয়ে না যায়। ঘষবার সময় পুরো ষ্ট্রোক দেবে। পুরো ষ্ট্রোক (full stroke) মানে আয়না কাচটা নিচের কাচ থেকে অর্ধেক মতো বেরিয়ে যাবে, সামনের ঝোঁকেও, পিছনের ঝোঁকেও। ছোটো ষ্ট্রোক হলে অর্ধেক ষ্ট্রোক (half stroke), সিকি ষ্ট্রোক (quarter stroke) এই রকম বলা হয়।

মাঝারি কার্বো 100 বা 150 নম্বর গুঁড়ো দিয়ে ঘষবার সময়ও পুরো ষ্ট্রোক চলবে। পনেরো মিনিট বাদে আবার

ফোকাল লেংথ দেখে নাও। মাঝারি কার্বোরাণ্ডামে ঘষা কাচে ফোকাস বুঝতে অনেক সুবিধা হবে, সূর্যের ছবি দেয়ালে বেশ পরিষ্কার হয়ে পড়বে, ঘষা কাচের পিঠটাও বেশিক্ষণ ভিজে থাকবে। মাঝারি কার্বোরাণ্ডামে ঘষে ফোকাল্ল লেংথকে 4 ফুট ২ ইঞ্চিতে দাঁড় করাও, তাহলেই চলবে। তারপর আর খানিকক্ষণ অর্ধেক ষ্ট্রোক দিয়ে ঘষো। ছোটো ষ্ট্রোকে ঘষলে কাচ বেশি ক্ষয় না, ডৌল নিখুঁত হয়।

আবার ভালো করে ধুয়ে নাও। যেন কোনও আঁচড়ের দাগ না লাগে। বড়ো দানা দু-একটা কোথাও লেগে থাকলেই সর্বনাশ, আঁচড়ের দাগ পড়বে।

মাঝারি কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়োর পরে মিহি গুঁড়ো (2F, 3F নম্বরের) দিয়ে একই ভাবে ঘষে যাও, শুধু অর্ধ ষ্ট্রোক থেকে কমিয়ে সিকি ষ্ট্রোকে ঘষবে। আবার বলছি : ষ্ট্রোক ঘষবে, ষ্ট্রোকের ফাঁকে ফাঁকে আয়নাটাকে একটু একটু করে ঘুরিয়ে দেবে, আর নিজেও চারিদিকে ঘুরবে। এই তিনটি গতি গ্রাইণ্ড বা পালিশ করবার সময় সর্বদা একই ভাবে লাগবে।

মিহি গুঁড়োর কার্বোর কাজ শেষ হলে আবার ভালো করে সব ধুয়ে ফেলবে। আর একবার ফোকাল লেংথ মেপে দেখতে পারো। আমরা ফোকাল লেংথ চার ফুট চাই। কিন্তু এক-আধ ইঞ্চি কম বেশি হলে কোনোই ক্ষতি নেই।

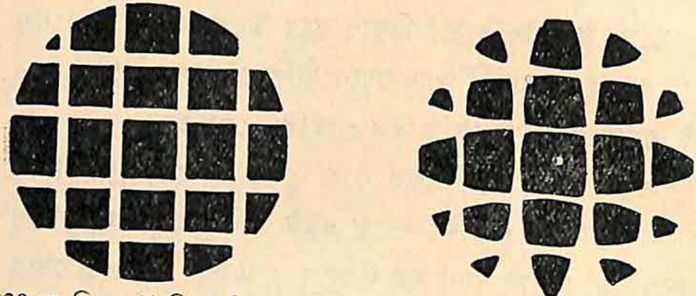
এবার এমারি গুঁড়ো দিয়ে সবচেয়ে ফাইন গ্রাইণ্ডিং করতে হবে। লেন্স গ্রাইণ্ডিং সম্পর্কে বলেছি কি করে এমারি

গুঁড়োকে জলে থিতিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। এখানেও তাই করবে। এমারি দিয়ে ঘষবে সিকি স্ট্রোকে। ঘণ্টা দেড় দুই এমারি দিয়ে ঘষলে ফাইন গ্রাইণ্ডিং শেষ হবে।

একটা কথা, পালিশের কাজ বেশ একঘেয়ে। মিহি কার্বোরাণ্ডাম ও এমারির কাজে একটু বেশি সময় দিলে পালিশ সহজেই হবে আর সময় অল্প লাগবে। এজন্য মিহি গুঁড়োর কাজে যারা ধৈর্য ধরে একটু বেশি খাটে তাদের পালিশের খাটুনি অনেক কম হয়।

এবার পালিশ করতে শুরু করা যাক। পাটার কাচের কনভেক্স পিঠে আধ আঙুল পুরু করে পিচ গালিয়ে ঢেলে দাও। কাচের পরিধি ঘিরে একটা কাগজের ফিতে আধ ইঞ্চি উঁচু করে লাগিয়ে দিয়ে থালার মতো হবে, তারপর পিচ গলিয়ে ঢালবে। গলা পিচ একটু শক্ত হলে কাগজের ফিতে খুলে ফেলো। আয়না-কাচে সাবানজল মাখিয়ে নরম পিচের ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাপ দাও। তাহলে পিচের পিঠে আয়না-কাচের ডৌল পাবে। পিচ বেশি শক্ত হয়ে গিয়ে থাকলে আবার একটু তাতিয়ে নরম করে ছাঁচ তুলতে হবে। সাবান জল মাখানো থাকলে পিচের সঙ্গে কাচ লেগে যাবে না।

পিচের পিঠ সমানভাবে ডৌল নিলে আয়না-কাচটা উঠিয়ে রেখে দাও। খানিকক্ষণ পিচকে ঠাণ্ডা হতে দাও। তারপর একটু ঠাণ্ডা জল বালতি থেকে নিয়ে পিচের ওপর আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। পিচ শক্ত হয়ে গেলে একটা ছুরি



30 নং চিত্র। (বাঁদিক) পিচের পিঠে চৌখুপ্পি কাটা পালিশ করবার ছাঁচ।
(ডানদিক) পালিশের পরে পর্‌বলয় করবার পিচের ছাঁচ।

দিয়ে কানার বাড়তি পিচ ছেঁটে পরিধিটা গোল করে নাও। এ সময় ছুরি আর পিচ জল দিয়ে ভিজিয়ে কাটবে, তাতে পিচের চটা উঠে যাবার ভয় থাকবে না।

এবার ছুরির ছুঁচলো মাথা দিয়ে পিচের পিঠে এক ইঞ্চি মতো চৌখুপ্পি কাটো (ছবিতে দেখো)। খাঁজগুলি গভীর হবে, কাচ অবধি হলে ভাল, V আকারে খাঁজ কাটবে। এ সময়ও ছুরি আর পিচ ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে কাটবে যাতে চটা উঠে না যায়। চৌখুপ্পি খাঁজ কাটা হলে পিচের গুঁড়ো ধুয়ে ফেলো। এটাই হলো পালিশ করবার পিচের ছাঁচ (pitch tool বা polishing tool)।

একটা পরিষ্কার বাটিতে দু-চামচ রুজ ও একটু জল দিয়ে গাঢ় করে মেখে রাখো। পরিষ্কার ন্যাকড়ার তুলি দিয়ে ঐ রুজ নিয়ে পিচের ছাঁচের ওপর বেশ করে মাখিয়ে নিয়ে আয়না-কাচটা ঘষতে থাকো। গ্রাইণ্ড করবার সময় যেমন ভাবে ঘষেছিলে তেমন ভাবে, অর্থাৎ ষ্ট্রোকের মাঝে মাঝে

আয়না-কাচ একটু একটু করে ঘোরাবে, নিজেও চারিদিকে ঘুরবে। পালিশের সময় ছোটো ষ্ট্রোকে ঘষবে, আধ বা সিকি ষ্ট্রোকে। মধ্যে মধ্যে রুজ আর জল দেবে।

আধঘণ্টা এই ভাবে পালিশ করলে দেখবে আয়না-কাচের মধ্যেটা স্বচ্ছ চকচকে হয়ে উঠেছে, ঘষা কাচের সাদা ভাব চলে গিয়েছে। যতো ঘষবে মধ্যের পালিশ জায়গাটা ততোই ছড়িয়ে বড়ো হতে থাকবে, অবশেষে সমস্ত আয়নাটাই পালিশ নেবে। পুরো পালিশ নিতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগতে পারে।

দূরবীন আয়না তৈরি শেষ হলো বলতে পারো।

তবে একটা সূক্ষ্ম কাজ বাকি থেকে গেলো! সেটা না করলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। তবে ব্যাপারটা বলে রাখি। ওপরের পদ্ধতিতে পালিশ-করা আয়নাটা হয়ে দাঁড়ালো গোল ডৌলের (spherical curvature)। হওয়া উচিত পরবলয় ডৌলের (parabolic curvature)। ছ ইঞ্চি দূরবীন আয়নায় চার ফুট ফোকাল লেংথ হলে গোল আর পরবলয় ডৌলের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। সেজন্যই বলছিলাম গোল ডৌলের পালিশের পর কাজ শেষ হলো বলা যায়। যদি পরবলয় ডৌল দিতে চাও তো আর একটু কাজ করতে হবে। কাজটা খুব শক্ত নয়। পিচের চাক্তির চৌখুপ্পি একটু নতুন করে কাটতে হবে। পালিশের ছাঁচটাই ব্যবহার করা চলবে! চৌখুপ্পির খাঁজগুলি কিনারের দিকে ক্রমশ চওড়া করে কেটে দাও। অর্থাৎ পিচের টালিগুলি মধ্যের দিকে বড়ো ও ধারের-গুলি ক্রমশ ছোটো হয়ে আসবে। যেমন ত্রিশ নম্বর

ছবিতে দেখানো হয়েছে। এবার আবার পালিশ চালাতে থাকো রুজ দিয়ে সিকি ষ্ট্রোকে। এভাবে আধঘণ্টা পালিশ করলে আয়নার পিঠ গোল থেকে পরবলয় ডৌল হয়ে দাঁড়াবে। পরবলয় ডৌলের মধ্যখানটা একটু বেশি গভীর হয় কিনারের তুলনায়। নতুন করে কাটা পিচের টালিগুলি মধ্যের দিকে বড়ো, কিনারের গুলি ক্রমশ ছোটো। তাই এই ছাঁচ দিয়ে পালিশ করলে আয়নার মধ্যটা একটু বেশি গভীর হয়ে পরবলয় আকার নেয়। তবে এই তারতম্য এতো সামান্য যে চোখে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। এর এক রকম পরীক্ষা আছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

ছ-সাত ইঞ্চি আকারের দূরবীন-আয়নায় গোল বা পরবলয় দুরকম ডৌলই চলতে পারে। তবে গোল ডৌলটা পালিশের পর নিখুঁত হলো কিনা সেটা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। পরিশিষ্টতে গোল-ডৌল পরীক্ষার পদ্ধতি আলাদা করে দিলাম।

পালিশের পর ডৌল পিঠে রুপোর আস্তর দিতে হবে। রুপোর আস্তর পড়বে ডৌলের পিঠে, অর্থাৎ যে পিঠটা এতো কষ্ট করে তৈরি করলে। তাহলে রুপোর আস্তর থাকবে সামনে। মুখ দেখবার আয়নায় চকচকে আস্তরটা থাকে কাচের পিছনে, দূরবীন আয়নায় থাকে সামনে। রুপোর আস্তর কী করে ফেলতে হয় তার ফরমুলা পরিশিষ্টতে আলাদা করে দিলাম।

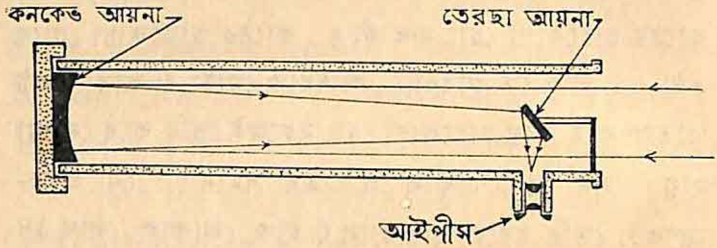
দূরবীন আয়নাকে সিলভার করার পর বাকি রইলো

দূরবীনের আকারে মাউন্ট করা। দূরবীনের চোং চাই। একদিকে থাকবে দূরবীন-আয়না, অন্যদিকে থাকবে আইপীস ইত্যাদি।

প্রথমে চোঙের কথা ধরা যাক। টিনের চোঙ করা যায়। কাঠের চারকোণা চোং মন্দ কী? কাঠের চারকোণা চোঙে এটা-ওটা লাগাতে সুবিধা। আধইঞ্চি মোটা বা আর একটু পাতলা কাঠ দিয়ে চারকোণা চোং সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায়। লম্বা হবে ফোকাল্ লেংথ-এর সমান। যে প্রতি-ফলকটা তৈরি করলে তার ব্যাস 6 ইঞ্চি, ফোকাল লেংথ 48 ইঞ্চি বা 4 ফুট। তা হলে চোং হবে চার ফুট লম্বা, ভেতরের মাপ সাত কি আট ইঞ্চি চারকোণা। দূরবীনের আয়নাটা একটা চারকোণা বাক্সের মধ্যে লাগাও, বাক্সসুদ্ধ ওটাকে চোঙের এক দিকে যেন লাগিয়ে দেওয়া যায়। যখন দূরবীন ব্যবহার হবে না তখন ওটা খুলে একটা চাকতি লাগিয়ে রাখবে, এতে রুপার আস্তরটা বেশি দিন চকচকে থাকবে।

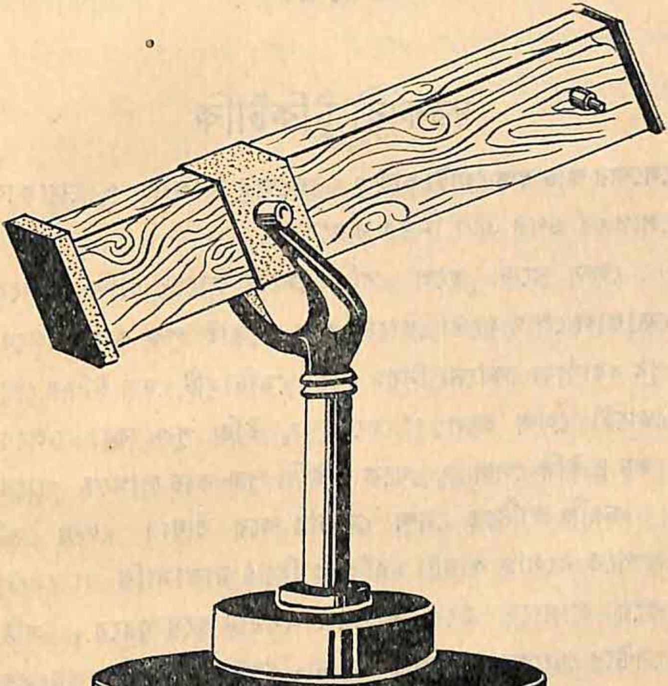
দূরবীন আয়নাটা চোঙের এক মুখে লাগিয়ে দেখে নাও চোঙের কত দূরে ফোকাস আসছে। ফোকাস থেকে 4 ইঞ্চি পিছিয়ে কাঠের চোঙের গায়ে একটা ফুটো করে ফুটোর ওপর আইপীস বসবে। আইপীসের নিচে চোঙের মাঝখানে একটা $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি × 2 ইঞ্চি মাপের সাধারণ আয়না তেরছা করে বসাও, লোহার শিকের সঙ্গে। এই তেরছা আয়নাকে বলে diagonal mirror বা সংক্ষেপে শুধু diagonal। দূরবীন আয়না থেকে

আলো এসে তেরছা আয়নায় ঠিকরে ছবিটা পড়বে আইপীসের মুখে। এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। 31 নম্বর ছবিতে দেখো।



31 নং চিত্র। দূরবীন চোঙের মধ্যে কোথায় কি বসবে।

দূরবীন তৈরি হয়ে গেলো। কিন্তু অতোবড়ো কাঠের চোংসুদ্ধ দূরবীনটা যথেষ্ট ভারী। হাতে তুলে দেখবার মতো মোটেই নয়। তাহলে একটি স্ট্যাণ্ড তৈরি করতে হয়। আর বন্দোবস্ত করতে হবে যাতে দূরবীনটা যেদিকে খুশি ঘোরানো যায়—ডাইনে বাঁয়ে ওপর নিচে। 32 নম্বর ছবিতে দেখো কী করে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে দূরবীন মাউন্ট করা হয়েছে।



32 নং চিত্র। চারকোণা কাঠের চোঙে মাউন্ট করা প্রতিফলক দূরবীন।

পরিশিষ্ট এক

দরকারী টুকিটাকি

লেন্সের কাচ কত মোটা চাই? লেন্সের আকার ও ফোকাল লেংথএর ওপর এটা নির্ভর করবে।

লেন্স বড়ো হলে বেশি মোটা কাচের চাক্তি লাগবে, ফোকাল লেংথ যতো ছোটো হবে ততোই পুরু কাচ লাগবে। খুব ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। মোটামুটি, দেড় ইঞ্চির চেয়ে ছোটো লেন্স হলে $\frac{1}{8}$ থেকে $\frac{3}{32}$ ইঞ্চি পুরু কাচ চলবে। দেড় দু ইঞ্চি লেন্স $\frac{3}{32}$ থেকে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি পুরু কাচ লাগতে পারে।

চরকি কাঠিতে লেন্স সেণ্টার করে বাঁধা। লেন্স তৈরি সম্পর্কে বলেছি কাচটা চরকি কাঠিতে মাঝামাঝি বা সেণ্টার করে লাগাতে হবে, না হলে অসমান হয়ে ঘুরবে। সঠিক সেণ্টার চোখের আন্দাজে হয় না; সেণ্টার করবার একটা সহজ উপায় আছে। কাচটা চরকি কাঠিতে লাগাও। চরকি কাঠি ঘোরাও। রজন নরম থাকতে থাকতে একটা কাঠের টুকরো লেন্স-কাচের পরিধির ওপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চেপে ধরো। অসমান ভাবে বসা কাচটা সেণ্টার হবে।

লেন্স ঘষবার পেতলের ছাঁচ। পেতলের মোটা চাদর বা ডাণ্ডা rod থেকে তৈরি হয়। ডৌল যে মাপের হবে সেই

মাপের একটা টিনের চাকতি কাঁটা-কম্পাস দিয়ে দাগ দিয়ে কেটে নাও। এটাই হল ডৌল কাটবার মাপ বা template। যে কারখানায় লেদ (lathe) আছে তারা এই টেম্প্লেট অনুসারে পেতলের মুখটা কেটে দেবে। উচিত, একই মাপের কনকেভ ও কনভেক্স ছাঁচ কাটিয়ে নেওয়া। তাতে পরস্পর ঘষে (কার্বো দিয়ে) সমান করে নেওয়া যায়।

দূরবীন আয়না থেকে কাঠের হাতল খুলবার উপায়। কাচের পিঠে কাঠের চাকাওয়ালা হ্যাণ্ডেল পিচ দিয়ে লাগানো হয়েছিলো, মনে আছে নিশ্চয়। এতো শক্ত হয়ে এঁটে যায় যে টেনে খোলা অসম্ভব। হাতে-সয় এমন গরম জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে পিচ নরম হয়ে যাবে, তখন খুলবে।

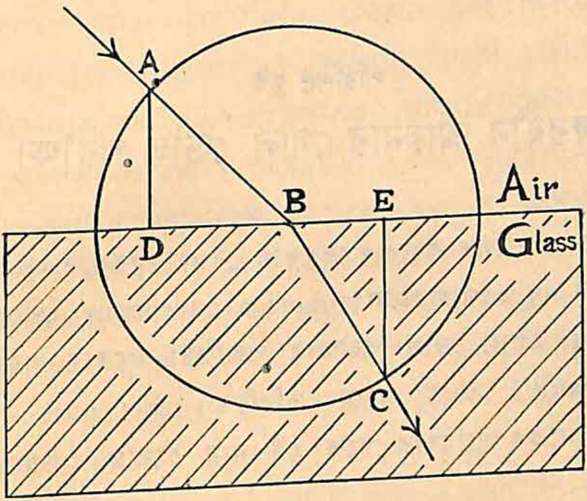
অন্য ভাবেও খোলা যায়। কয়েকটা খবরের কাগজ মোটা করে ভাঁজ করে নাও। হ্যাণ্ডেলসুদ্ধ আয়নাটা উপুড় করে রাখো তার ওপর। এক হাত লম্বা একটা কাঠের টুকরো নাও। হ্যাণ্ডেলের কাঠের চাক্তির গায়ে এটাকে ঠেকিয়ে ধরো কাচ বরাবর। অন্যদিকে কাচটাকে পা দিয়ে আটকে রাখো। এবার কাঠের লাঠির আগার হাতুড়ি দিয়ে ঘা দাও। কাচ থেকে হ্যাণ্ডেলটা খুলে আসবে।

পিচের পালিশ-ছাঁচের কঠিনতা নিয়ন্ত্রণ। লেন্স বা দূরবীন-আয়না পালিশ করতে পিচের ছাঁচ লাগে। শুধু পিচ সরাসরি ব্যবহার করলে একটু বিপদ হতে পারে। পিচ যদি বেশি কঠিন হয় তাহলে পালিশ করলে কাচের ওপর আঁচড়ের দাগ (Scratch) পড়তে পারে। এজন্য পিচ একটু নরম

করে নেওয়া ভালো। এক পাউণ্ড পিচে চা-চামচের এক চামচ তার্পিন তেল মিশিয়ে নিলেই চলবে। পিচ গলিয়ে তার মধ্যে তার্পিন তেল কাঠি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সাবধান, তার্পিন তেল জ্বলে উঠতে পারে। সেজন্য গলা পিচের বাটি উনান থেকে নামিয়ে তার্পিন মেশাবে। আগুন ধরে গেলে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া যায়।

অতিরিক্ত কঠিন পিচ যেমন পালিশের পক্ষে ক্ষতিকর, বেশি নরম পিচও তেমনি খারাপ; সামান্য তার্পিন তেল দিয়ে যেটুকু নরম হবে সেটা হয়তো বুঝতেই পারবে না, কিন্তু তাতেই কাজ হবে। তার্পিন তেলের বদলে ঐ পরিমাণে মোম (bees wax) মিশিয়ে দিলেও পিচ নরম হবে। এই ভাবে সামান্য নরম করাকে বলে 'টেম্পার' (temper) করা

প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) কাকে বলে? 'তিন' অধ্যায়ে বলেছি কাচের আলো বাঁকানোর ক্ষমতা মাপা হয় প্রতিসরাঙ্ক বা refractive index দিয়ে। আলোকরশ্মি যায় সরল রেখা ধরে। তবে কথা হচ্ছে এই যে, যতোক্ষণ শুধু বাতাস বা জল বা কাচের মধ্য দিয়ে আলো যায় ততোক্ষণ সরল পথে যায়। অর্থাৎ একই মাধ্যমে (medium) যতোক্ষণ থাকে, সরল পথে চলে। বাতাস, জল, কাচ ইত্যাদি হলো আলো যাওয়ায় বিভিন্ন মাধ্যম। কিন্তু যখন আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন দিক পরিবর্তন করে। একে বলে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ (refraction of light)। ছবিতে



33 নং চিত্র। প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) নির্ধারণ।
(প্রতিসরাঙ্ক = BD ÷ BE)

দেখো, A B রশ্মি কাচের মধ্যে প্রবেশ করে বাঁকাপথ B C ধরেছে। এবার B কে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁকো। A থেকে কাচের পিঠে AD লম্ব (perpendicular) টানো। তেমনি C থেকেও কাচের পিঠে CE লম্ব টানো। BD আর আর BE মেপে নাও। BDর মাপকে BEর মাপ দিয়ে ভাগ দিলে যে সংখ্যা পাবে সেটাই হলো কাচের প্রতিসরাঙ্ক বা refractive index। যদি BD = $1\frac{1}{8}$ ইঞ্চি আরBD = $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি হয় তাহলে প্রতিসরাঙ্ক $m = 1\frac{1}{8} \div \frac{3}{4} = 1\frac{1}{2}$ বা 1·5 হবে।

পরিশিষ্ট দুই

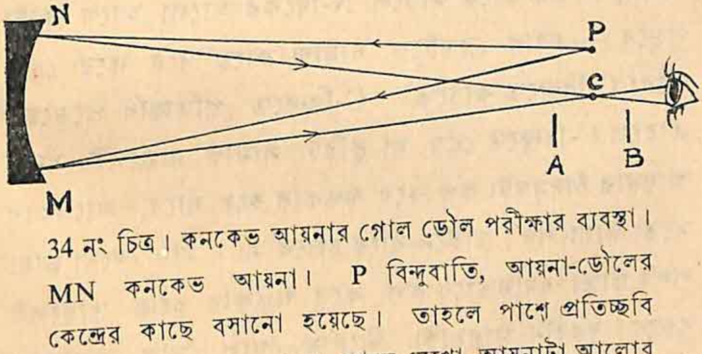
দূরবীন আয়নার গোল ডৌল পরীক্ষা

গ্রাইণ্ড ও পালিশ করার পরে দেখে নেওয়া দরকার দূরবীন আয়না নিখুঁত গোল ডৌল (spherical curvature) পেয়েছে কিনা। গোল ডৌল পরীক্ষার পদ্ধতিটা ফুকোর পরীক্ষা Foucault's test নামে পরিচিত। Foucault নামে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার থেকে এই নাম হয়েছে। উচ্চারণ, ফুকো।

রুজ দিয়ে পালিশ-করা আয়নাটাকে ঘরের এক প্রান্তে দাঁড় করিয়ে রাখো। একটা ছোটো টেবিলের ওপর রাখবে। ফোকাল লেংথএর দ্বিগুণ দূরে আর-একটা টেবিল রাখো। একটা ছোটো আলো, ধরো, টর্চ লাইট নাও। সামনেটা কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দাও, মধ্যে একটা ছোটো পিনের ফুটো রাখবে, যাতে টর্চ জাললে শুধু পিনের ফুটো দিয়ে আলো বেরোয়। এটাকে বলে বিন্দু বাতি বা Pinhole lamp বা point source of light। আয়নাটা যদি ঠিকমতো সামনে ফেরানো থাকে তাহলে বিন্দুবাতির আলো প্রতি-ফলিত হয়ে আলোর কাছেই ফিরে আসবে, নজর করে দেখলে একটা আলোর বিন্দু চিকচিক করছে দেখতে পাবে। এ সময় ঘরটা মোটামুটি অন্ধকার করে নিলে দেখতে সুবিধা

হবে। এবার বিন্দুবাতিটা এদিক ওদিক সরিয়ে এমন করো যাতে ঐ প্রতিফলিত আলোর বিন্দুটা বাতির বেশ কাছাকাছি আসে। প্রতিফলিত আলোর বিন্দুটাই হলো বিন্দুবাতির প্রতিচ্ছবি (image)।

এবার ঐ বিন্দুপ্রতিচ্ছবির দিকে নজর রেখে এগিয়ে যাও। বিন্দুপ্রতিচ্ছবির খুব কাছে চোখ নিয়ে এলে আলোর বিন্দুটা ঝাপসা হয়ে যাবে। তার বদলে দেখবে আয়নার চাক্তিটা আলোয় ঝলমল করছে, পূর্ণিমা-চাঁদের মতো। ঠিক হয়েছে। চোখ স্থির রাখো। একটা ছুরি বা পুরানো দাড়িকামানোর



34 নং চিত্র। কনকেভ আয়নার গোল ডৌল পরীক্ষার ব্যবস্থা। MN কনকেভ আয়না। P বিন্দুবাতি, আয়না-ডৌলের কেন্দ্রের কাছে বসানো হয়েছে। তাহলে পাশে প্রতিচ্ছবি পড়বে C বিন্দুতে। চোখ কাছে রেখো, আয়নাটা আলোর চাকার মতো দেখবে। A থেকে আলোর কোণকে ছুরি দিয়ে কাটলে M থেকে N এর দিকে ছায়া চলবে ; Bতে কাটলে N থেকে M এর দিকে ছায়া চলবে। Cতে কাটলে আয়নার আলো একবারে ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যাবে। তাহলে ডৌল ঠিক হয়েছে।

ব্লেড দিয়ে চোখের সামনে আয়নার আলোকে আস্তে করে কাটবার চেষ্টা করো। ব্লেডটা খুব সামান্য নাড়বে। দেখবে একটা কালো ছায়া আয়নার ঝলমলে চাকার ওপর আসছে। ব্লেড চালালে ছায়ার পর্দাও চলবে। যদি ব্লেডটা প্রতিফলিত বিন্দুর আগে আয়নার দিকে (A-র কাছে) থাকে তাহলে ব্লেড নড়ার সঙ্গে একই দিকে ছায়া পর্দা চলবে। কিন্তু যদি ব্লেডটা ঐ বিন্দুর পিছনে (চোখের দিকে Bএর কাছে) থাকে তাহলে ব্লেডের গতির উল্টো দিকে ছায়াপর্দা চলবে। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে কেন এমন হবে। A-র কাছে কাটলে আয়নার M-দিকের আলো কাটা পড়বে আগে, B-এর কাছে কাটলে N-দিকের আলো আগে কাটা পড়বে।—এবার ব্লেডটকে সামান্য কাছে দূরে করে চেষ্টা করো C-বিন্দুতে কাটতে। C-বিন্দুতে প্রতিচ্ছবি পড়েছে। তাহলে C-বিন্দুতে ব্লেড বা ছুরিটা সামান্য এগুলেই সমস্ত আয়নার চাঁদমুখটা ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যাবে, আগেকার মতো ছায়া-পর্দা ডাইনে-বাঁয়ে চলবে না। যদি দেখো ছায়া পর্দা ছাড়া এমনিভাবে ঝপ করে অন্ধকার হচ্ছে তাহলেই বুঝবে দূরবীন-আয়নাটা নির্দোষ গোল ডৌল পেয়েছে। ডৌলে দোষ থাকলে ছুরির কোনো অবস্থানেই এমন ঝপ করে অন্ধকার করতে পারবে না, সর্বদাই কোনো না কোনো দিকে ছায়া-পর্দা চলতে দেখবে। এই হলো ফুকোর ছুরি পরীক্ষা (Foucault's knife edge test)।

এই পরীক্ষায় যদি ডৌলে দোষ দেখা যায় তাহলে পালিশের কাজ, আরো কিছুক্ষণ চালাতে হবে। ছোটো স্ট্রোক দিয়ে পালিশ চালালে আস্তে আস্তে দোষ চলে যাবে। গোড়া থেকে সাবধান হয়ে গ্রাউণ্ড ও পালিশ করলে কখনও ডৌলে দোষ আসবে না, একবারেই উতরে যাবে।

পরিশিষ্ট তিন

দূরবীন আয়নায় রৌপ্য পাতন (Silvering)

কয়েক রকম পদ্ধতি আছে। এখানে ব্রেসিয়ারের পদ্ধতির (Brashear's process) কথা বলবো। দূরবীন আয়নাকে পরিষ্কার করে ধুয়ে একটা কাচের থালায় (glass dish) জলে ডুবিয়ে রাখতে হয়। দুরকম সলিউশন তৈরি করতে হয় : একটাকে বলে রিডিউসিং সলিউশন (reducing solution), অন্যটা সিলভারিং সলিউশন (silvering solution)। এই দুই সলিউশন একত্রে মিশিয়ে থালার জলে ঢেলে দিলেই সিলভারিং সলিউশন থেকে রুপো আলাদা হয়ে আয়নার কাচের ওপর পড়তে থাকে।

এবার বিস্তৃত বিবরণ দিই। তিন ভাগে সলিউশন করতে হবে (A.B,C)। A-রিডিউসিং সলিউশন :—

পরিষ্কার দোবারা চিনি	45 gm (গ্রাম)
নাইট্রিক অ্যাসিড	2 gm
ডিস্টিল্ড জল	500 c.c. (কিউবিক সেন্টিমিটার)

অ্যালকোহল (ইথাইল) 88 c c.

প্রথমেই চিনি, অ্যাসিড ও জল মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে নাও। ঠাণ্ডা হলে অ্যালকোহল মেশাও। এই

হলো রিডিউসিং সলিউশন। পুরানো হলে ভালো কাজ হয়। তাই পাঁচ-সাত দিন আগে তৈরি করে রাখলে ভাল।

সিলভারিং সলিউশন দু ভাগে হবে B. C.।

B.—সিলভার নাইট্রেট 15 gm + ডিস্‌টিল্ড জল 150 c.c.

C.—কস্‌টিক পটাশ 8 gm + ডিস্‌টিল্ড জল 80 c.c.

ছ-ইঞ্চি ব্যাসের আয়নায় উপরতল হচ্ছে 28 বর্গইঞ্চি। তার জন্য আমাদের লাগবে A—42 c.c., B—70 c.c. সলিউশন। ছোটো বা বড়ো আয়না হলে বর্গইঞ্চি অনুপাতে সলিউশনের পরিমাণ লাগবে।

আয়নার কাচটা খুব ভালো করে ধুতে হবে। প্রথমে সাবান জলে, তারপরে কস্‌টিক পটাশ সলিউশনে (C-সলিউশন যথেষ্ট বাড়তি আছে, তারই একটু নিয়ে), সবশেষে নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে। প্রতিবারেই ডিস্‌টিল্ড জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবে। ধোয়ার সময় কখনও কাচের ওপর হাত দিও না, মোটাকাচের ধার ধরে ধোয়ার কাজ করবে। ভালো করে ধোয়া হলে কাচটাকে চিত করে অর্থাৎ কনকেভ দিকটা ওপর করে কাচের থালার মধ্যে রেখে ডিস্‌টিল্ড জল ঢেলে দাও যাতে কাচটা সম্পূর্ণ ডুবে থাকে।

এবার 70 c.c. B-সলিউশনে ফোঁটা ফোঁটা করে অ্যামোনিয়া (Strong liquor ammonia) দাও আর কাচের কাঠি (glass rod) দিয়ে ভাল করে মেশাতে থাকো। প্রথমে অ্যামোনিয়া দিলেই সলিউশনটা কালো হয়ে যাবে।

কিন্তু যেমন অ্যামোনিয়া বাড়বে, সলিউশনটা পরিষ্কার হয়ে আসবে। একটু ঘোলা ভাব রেখে অ্যামোনিয়া বন্ধ করো।

এখন এর মধ্যে C-সলিউশন 35 c.c. মিশিয়ে দাও। আবার সব কালো হয়ে যাবে। আবার আগেকার মতো ফোঁটা ফোঁটা করে অ্যামোনিয়া মেশাতে থাকো। যখন হালকা হলদে রঙ আসবে তখন অ্যামোনিয়া বন্ধ করবে। বেশি এমোনিয়া যেন না হয়, তাহলে একেবারে সাদা হয়ে যাবে। এখন B-সলিউশন 20 c.c. আন্দাজ মেশাও। আবার সব কালো হয়ে যাবে। কালো সলিউশনটা ফিলটার করে নাও। হালকা হলদে রঙের সলিউশন পাবে।

এই ফিলটার-করা হলদে সলিউশনের সঙ্গে 42 c.c. A-সলিউশন মিশিয়ে তক্ষুনি আয়না-ডোবানো থালার জলে ঢেলে দাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিলভারিং শেষ হবে। সলিউশনটা ঘোলা নোংরা দেখাবে, তাতে কিছু ভাববার নেই। পাঁচ মিনিট পরে সলিউশন ফেলে দিয়ে আয়নাটা খুব সাবধানে জলে ধুয়ে ফেলবে। রুপোর আস্তরটা খুব পাতলা, হাত লাগলেই উঠে যাবে, ধোবার জন্য জল ঢালবে খুব আস্তে আস্তে। ধোয়ার পর আয়নাটাকে দাঁড় করিয়ে জল ঝরিয়ে হাওয়ায় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নাও। রুপোর আস্তরে কখনও হাত দিও না, দাগ ধরবে।

পরিশিষ্ট চার

আলোকবিজ্ঞানের কয়েকটি সূত্র

নানারকমের বীক্ষণযন্ত্র তৈরি করতে শিখলে। নিজ হাতে লেন্স, মাইক্রস্কোপ, দূরবীন ইত্যাদি তৈরি করে খুব আনন্দ পাবে। বীক্ষণ-শিল্প বেশ ভালো করে আয়ত্ত করতে হলে আলোক-বিজ্ঞানের কয়েকটি নিয়ম বা সূত্র জানা দরকার। তোমাদের মনেও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। যেমন, জিজ্ঞাসা করতে পারো : কনভেক্স লেন্স দিয়ে দূরবীনও তৈরি হয়, মাইক্রস্কোপও তৈরি হয়, আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাসও হয়; কী করে হয়? পার্থক্য কী? কিংবা, জিজ্ঞাসা করতে পারো, কনভেক্স লেন্স দিয়ে দূরবীন তৈরি করলে বর্ণাপেরণ দোষ হতে পারে, কনকেভ আয়না দিয়ে তৈরি করলে সে দোষ একেবারেই আসে না কেন?

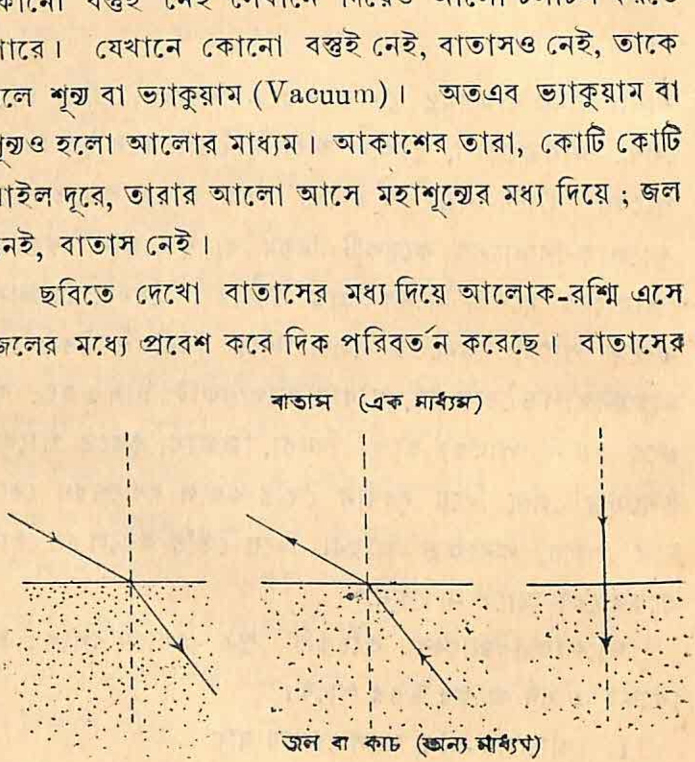
আলোক-বিজ্ঞানের কয়েকটি সূত্র এখানে বলবো, তা থেকেই এ সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।

1. আলোক-রশ্মি সরল রেখায় যায়।

2 আলোক-রশ্মি এক মাধ্যম (medium) থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করবার সময় পথ বা দিক পরিবর্তন করে। যার মধ্য দিয়ে আলো যায় তাকে বলে আলোর মাধ্যম (medium)।

বাতাস, জল, কাচ ইত্যাদি স্বচ্ছ (transparent) বস্তুগুলি আলোর বিভিন্ন মাধ্যম, কারণ এদের মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে। আরো কতো স্বচ্ছ বস্তু আছে, যেমন, তেল, হীরা ইত্যাদি। এরাও আলোর মাধ্যম। যেখানে কোনো বস্তুই নেই সেখানে দিয়েও আলো চলাচল করতে পারে। যেখানে কোনো বস্তুই নেই, বাতাসও নেই, তাকে বলে শূন্য বা ভ্যাকুয়াম (Vacuum)। অতএব ভ্যাকুয়াম বা শূন্যও হলো আলোর মাধ্যম। আকাশের তারা, কোটি কোটি মাইল দূরে, তারার আলো আসে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে ; জল নেই, বাতাস নেই।

ছবিতে দেখো বাতাসের মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি এসে জলের মধ্যে প্রবেশ করে দিক পরিবর্তন করেছে। বাতাসের



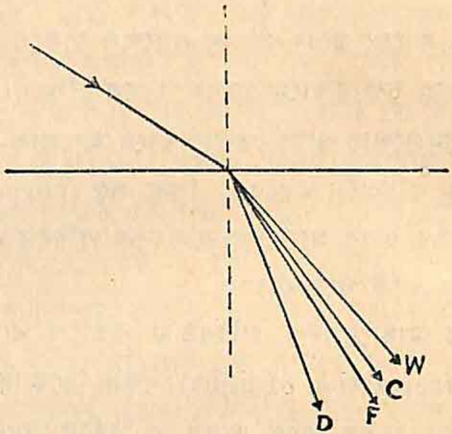
35 নং চিত্র। দুই মাধ্যমের বিচ্ছেদ তলের ওপর তেরছা ভাবে আলো পড়লে প্রতিসরণ হবে বা বেঁকবে। কিন্তু লম্বভাবে পড়লে সোজা যাবে, যেমন তৃতীয় ছবিতে।

মধ্য থেকে কাচের মধ্যে প্রবেশ করলেও বেঁকবে। অর্থাৎ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে বেঁকবে। তবে একটা কথা, মাধ্যমগুলোর ওপর তেরছা ভাবে আলোক-রশ্মি পড়লে তবেই দিক পরিবর্তন করবে। কিন্তু লম্ব (perpendicular) ভাবে তলের ওপর আলো পড়লে দিক পরিবর্তন করবে না, সোজাসুজি একই পথে যাবে।

দ্বিতীয় মাধ্যমে দিক পরিবর্তন করাকে বলে আলোর প্রতিসরণ (refraction of light)। কোন্ দিকে দিক পরিবর্তন করবে সেটা নির্ভর করে প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের গুণের ওপর, বা লঘুত্ব-গুরুত্বের ওপর।

লঘু থেকে গুরু মাধ্যমে প্রবেশ করলে লম্বের দিকে (towards perpendicular) বেঁকবে। তেমনি গুরু থেকে লঘু মাধ্যমে আলো যাবার সময় লম্বের বিপরীত দিকে বেঁকবে। বাতাস হলো লঘু মাধ্যম, বাতাসের তুলনায় জল বা কাচ হলো গুরু বা ঘন মাধ্যম।

কোন্ দিকে প্রতিসরণ হবে (বেঁকবে) সে কথা বললাম। কতোটা বেঁকবে সে কথা বলছি। মনে করো, বাতাসের মধ্য দিয়ে আলো এসে দ্বিতীয় মাধ্যমে পড়ছে একই ভাবে, অর্থাৎ একই কোণে (Angle)। প্রথমে ধরো, দ্বিতীয় মাধ্যমটা জল। তাহলে (36 নং ছবিতে দেখো) W রেখা ধরে আলোক-রশ্মি যাবে। যদি দ্বিতীয় মাধ্যমটা ক্রাউন কাচ হয়, তাহলে C রেখা বরাবর যাবে। দ্বিতীয় মাধ্যম যদি ফ্লিণ্ট কাচ হয় তাহলে F রেখা ধরে যাবে। যদি দ্বিতীয়



36 নং চিত্র। একই ভাবে আলো এসে পড়লেও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রবেশ করবার সময় বিভিন্ন ভাবে বেঁকবে।

মাধ্যম হীরা হয় তাহলে D-বরাবর যাবে। এখন দেখছো, একই ভাবে আলো এসে পড়লেও বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে বেঁকছে। আর দেখছো, জলের চেয়ে ক্রাউন কাচের আলো বাঁকানোর ক্ষমতা বেশি, ক্রাউনের চেয়ে ফ্লিণ্ট কাচের আলো বাঁকানোর (প্রতিসরণ করবার) ক্ষমতা বেশি, এবং তার চেয়েও বেশি হীরার। আগে বলেছি আলো বাঁকানোর ক্ষমতা মাপা হয় 'প্রতিসরাঙ্ক' (refractive index) দিয়ে। তাহলে দাঁড়ালো : জলের প্রতিসরাঙ্ক কম, ক্রাউন কাচের প্রতিসরাঙ্ক তার চেয়ে বেশি, ফ্লিণ্ট কাচের আর একটু বেশি, হীরার আরও বেশি। প্রতিসরাঙ্ক কী করে মাপা যায় তৃতীয় পরিশিষ্টতে বলেছি। এই চারটি বস্তুর প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) এই রকম :—

বস্তু	প্রতিসরাঙ্ক
জল	1·3
ক্রাউন কাচ	1·5
ফ্লিন্ট কাচ	1·6
হীরা	2·4

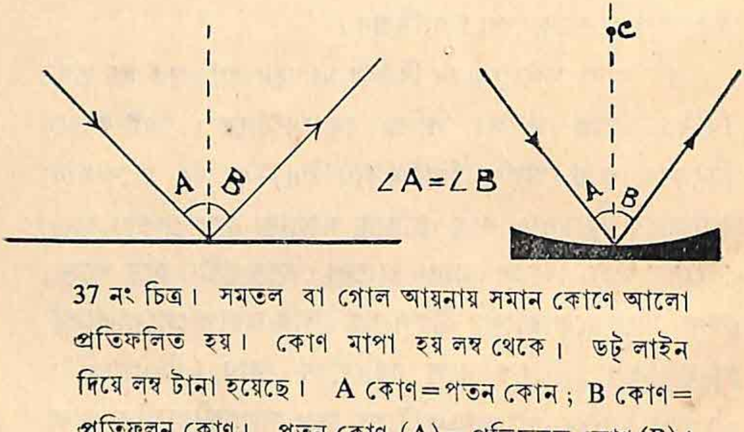
3. সাদা আলো (যেমন, সূর্যের, ইলেকট্রিক লাইটের, ইত্যাদি) রঙের আলোর সংমিশ্রণ।

4. সাদা আলো যখন দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় তখন বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন কোণে বাঁকে। এই কারণে ত্রিকোণ কাচ অর্থাৎ প্রিজম (prism)-এর মধ্য দিয়ে সাদা আলোকে রামধনু রঙে ছড়িয়ে আলাদা করে দেওয়া যায়। লেন্সের মধ্য দিয়েও সাদা আলো ভেঙে রঙীন হয়ে পড়ে। লেন্স দিয়ে জোরালো বীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি করতে গেলে এতেই হয় মুশকিল। একে বলে বর্ণাপেরণ দোষ (chormatic aberration)। এই দোষ কাটাতে হলে অ্যাক্রোম্যাটিক লেন্স দরকার। এ সম্বন্ধে 'ছয়' অধ্যায়ে বলেছি।

5. কিন্তু আয়নায় যখন আলো প্রতিফলিত (reflected) হয় তখন সব রঙের আলোই সমান কোণে প্রতিফলিত হয়, রং বিভক্ত হয় না, সাদা আলো সাদাই থাকে। এজন্য কনকেভ আয়না দিয়ে প্রতিফলক দূরবীন তৈরী করলে বর্ণাপেরণ দোষ একেবারেই হয় না। এ সম্বন্ধে দশম অধ্যায়ে বলেছি।

6. সমতল আয়নার আলো প্রতিফলিত হয় সমান

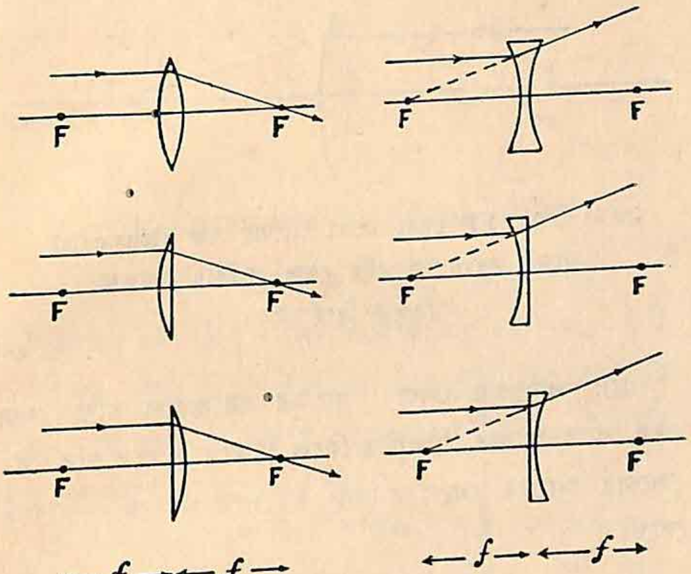
কোণে। কোণ (angle) মাপা হয় লম্ব বা perpendicular থেকে। যে দিকে আলো এসে পড়ে সেটার নাম পতন কোণ [angle of incidence], যেদিকে প্রতিফলিত হয় সেটার নাম প্রতিফলন কোণ (angle of reflection)। পতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয়। ছবিতে A কোণ = B কোণ।



37 নং চিত্র। সমতল বা গোল আয়নায় সমান কোণে আলো প্রতিফলিত হয়। কোণ মাপা হয় লম্ব থেকে। ডট্‌ লাইন দিয়ে লম্ব টানা হয়েছে। A কোণ = পতন কোন; B কোণ = প্রতিফলন কোণ। পতন কোণ (A) = প্রতিফলক কোণ (B)।

7. গোল ডৌলের আয়নাতেও পতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান হয়। গোলের পিঠে লম্ব টানা মানে গোলকের কেন্দ্র (C) দিয়ে রেখা টানা। ছবিতে দেখো। এখানেও A কোণ = B কোণ।

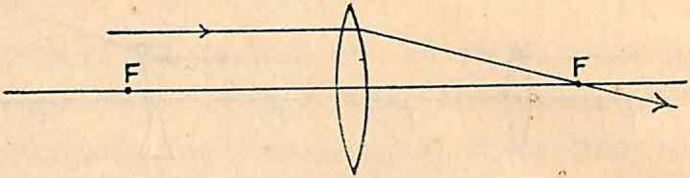
8. প্রতি লেন্সের দুদিকেই ফোকাল বিন্দু (focal point) থাকে। অর্থাৎ লেন্সটা এপিঠ ওপিঠ ঘুরিয়ে ধরলে কিছু তফাত হয় না। লেন্স থেকে ফোকাল বিন্দুর দূরত্বই



38 নং চিত্র। লেন্সের দুদিকে ফোকাল বিন্দু (F) থাকে। লেন্স থেকে ফোকাস বিন্দুর দূরত্বকে বলে ফোকাল লেংথ। দুদিকের ফোকাল লেংথ সমান।

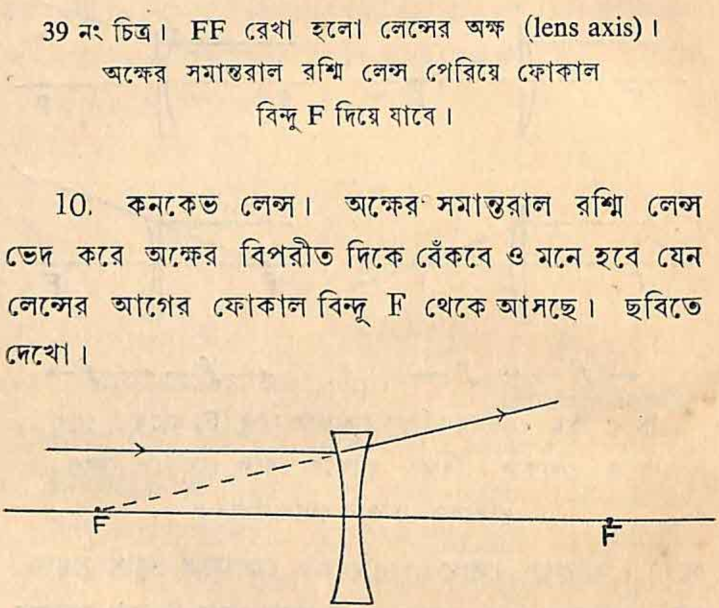
হলো ফোকাল লেংথ। দুদিকের ফোকাল লেংথ সমান। দুই ফোকাল বিন্দু যোগ করে সরল রেখা টানলে লেন্সের অক্ষ (axis of lens) পাওয়া যায়। লেন্সের মধ্য দিয়ে কি ভাবে আলোকরশ্মি যায় তার তিনটি প্রধান নিয়ম বলেছি (9, 10, 11, দেখো।) এই তিনটি সূত্র খুব দরকারী।

9. কনভেক্স লেন্স। অক্ষের সমান্তরাল (parallel) রশ্মি লেন্স ভেদ করে অক্ষের দিকে বেঁকবে ও ফোকাল বিন্দু F দিয়ে যাবে। ছবিতে দেখো।



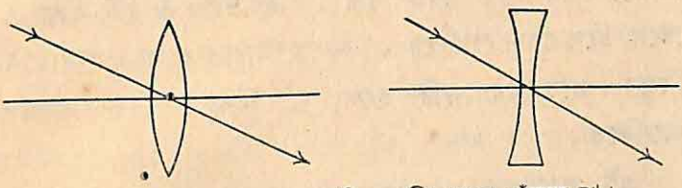
39 নং চিত্র। FF রেখা হলো লেন্সের অক্ষ (lens axis)। অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি লেন্স পেরিয়ে ফোকাল বিন্দু F দিয়ে যাবে।

10. কনকেভ লেন্স। অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি লেন্স ভেদ করে অক্ষের বিপরীত দিকে বেঁকবে ও মনে হবে যেন লেন্সের আগের ফোকাল বিন্দু F থেকে আসছে। ছবিতে দেখো।



40 নং চিত্র। কনকেভ লেন্স হলে অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি এমনভাবে বেঁকবে যেন মনে হবে আগের F থেকে আসছে।

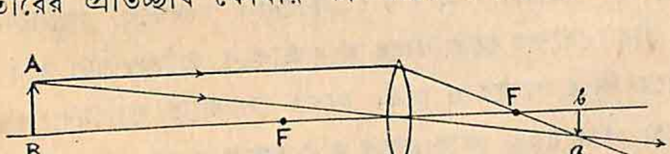
11. কনভেক্স বা কনকেভ লেন্সের মধ্যবিন্দু দিয়ে যে রশ্মি ভেদ করে যায় সে রশ্মি দিক পরিবর্তন করে না, সরাসরি সোজাপথে বেরিয়ে যায়। 41 নং ছবিতে দেখো।



41 নং চিত্র। লেন্সের কেন্দ্র দিয়ে রশ্মি গেলে বেঁকবে না।

9. 10. 11. সূত্র তিনটি মনে রাখলে বুঝতে পারবে কী করে লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে প্রতিচ্ছবি (image) সৃষ্টি হয়। বস্তু (object) থেকে আলো এসে লেন্স পেরিয়ে আবার মিলিত হয়ে বস্তুর প্রতিচ্ছবি (image) সৃষ্টি হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেখলেই বুঝতে পারবে।

12. কনভেক্স লেন্স দিয়ে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি। লেন্সের এক-দিকে একটা বস্তু আছে, বস্তুটি একটি তীর। দেখা যাক তীরের প্রতিচ্ছবি কোথায় কী ভাবে পড়ে। তীরের দুই



42 নং চিত্র। কনভেক্স লেন্স দিয়ে বস্তুর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি।
(বস্তু AB, প্রতিচ্ছবি ab)

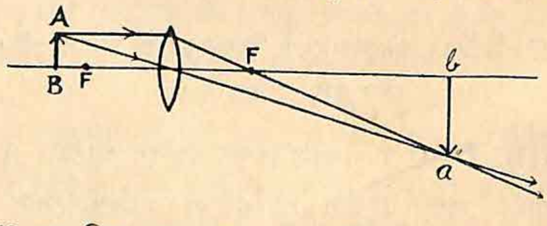
সীমা A.B. তীরটা ফোকাল বিন্দুর বাইরে আছে। A থেকে যে রশ্মিটা লেন্স অক্ষের সমান্তরাল আসছে সেটা লেন্স পেরিয়ে ফোকাল বিন্দু F দিয়ে যাবে 9 নম্বর সূত্র অনুসারে। আর যে রশ্মিটা লেন্সের কেন্দ্র দিয়ে যাচ্ছে সেটা সোজাসুজি

বেরিয়ে যাবে (11 নম্বর সূত্র)। এইভাবে ঐ দুটি রশ্মি A থেকে এসে লেন্স পেরিয়ে a বিন্দুতে মিলিত হলো। অর্থাৎ A বিন্দুর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হলো a বিন্দুতে এবং অক্ষের অন্যদিকে।

এই ভাবে AB বস্তুর প্রতিচ্ছবি উলটো হয়ে abতে সৃষ্টি হলো। এখানে এক খণ্ড সাদা কাগজ ধরো, ab ছবিটা দেখতে পাবে। তাই, একে বলে প্রকৃত প্রতিচ্ছবি (real image)।

এভাবেই ক্যামেরায় উলটো ছবি পড়ে। দূরবীনেও অবজেক্ট লেন্স দিয়ে এই ভাবে ছবি পড়ে, সেটাকেই আই-পীস দিয়ে বড়ো করে দেখা হয়।

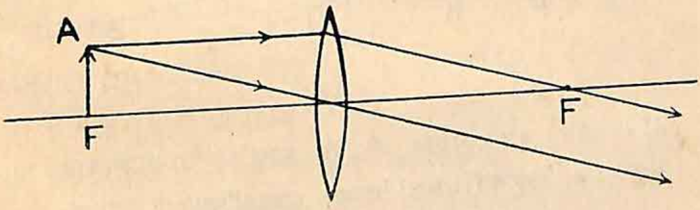
একটা ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখতে পারো, কাগজে কলমে। বস্তুটাকে লেন্সের কাছে বা দূরে করে ঐ দুটি সূত্রের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি টানো। দেখবে বস্তুটাকে (তীর) লেন্সের যতো কাছে করে আঁকবে, প্রতিচ্ছবিটা ততো দূরে গিয়ে পড়বে ও বড়ো হবে। সত্যিতে ক্যামেরাতেও তো তাই হয়। কাছ থেকে ছবি তুললে বড়ো ছবি হয়।



43 নং চিত্র। বস্তু (AB) ফোকাস বিন্দুর কাছে আনলে প্রতিচ্ছবি (ab) দূরে পড়বে ও বড়ো হবে।

বস্তুটাকে ফোকাস বিন্দুর খুব কাছে আনলে প্রতিচ্ছবি পড়বে খুব দূরে এবং খুব বড়ো হয়ে। এভাবেই মাইক্রস্কোপের অবজেক্ট লেন্স দিয়ে প্রাথমিক পরিবর্ধন (primary magnification) হয়। ছবিতে দেখো। প্রথম ধাপে বাড়ানো প্রতিচ্ছবিটা মাইক্রস্কোপের আইপীসের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় ধাপে আরো বড়ো করে দেখা হয়। এই ভাবে পূর্ণ পরিবর্ধন (total magnification) পাওয়া যায়। মাইক্রস্কোপ অধ্যায়ে সেকথা বলেছি। আসল ব্যাপারটা এবার বুঝলে।

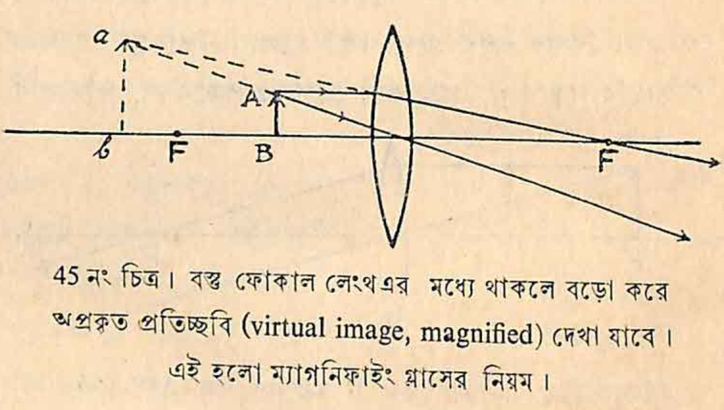
এবার মনে করো বস্তুটাকে কাছে আনতে আনতে ফোকাস বিন্দুর ওপর এনে ফেলা হলো। তাহলে কোথায় প্রতিচ্ছবি পড়বে? প্রতিচ্ছবি কোথাও পড়বে না, প্রতিচ্ছবি



44 নং চিত্র। ফোকাস বিন্দু F এর ওপর বস্তু (AF) রাখলে আলোকরশ্মি লেন্স ভেদ করে সমান্তরাল হয়ে বেরোবে। প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হবে না।

হবেই না। কেন? আগেকার নিয়ম দুটি ধরে প্রতিচ্ছবি আঁকার চেষ্টা করো। লেন্স পেরিয়ে দুটো রশ্মি পরস্পর সমান্তরাল (parallel) হয়ে বেরুচ্ছে। সমান্তরাল রশ্মি কোনো বিন্দুতে একত্রিত হয়ে মিশবে না, প্রতিচ্ছবিও তৈরী হবে না।

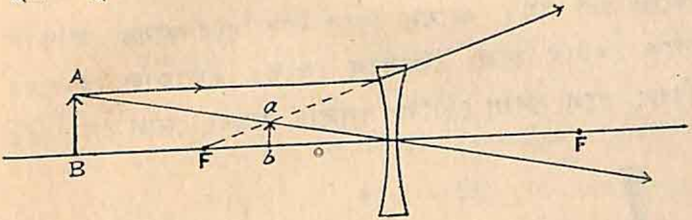
কিন্তু যদি বস্তুটা ফোকাস বিন্দুর মধ্যে অর্থাৎ লেন্সের দিকে থাকে তাহলে কোথায় প্রতিচ্ছবি পড়বে? আবার 9 আর 11 নম্বর নিয়ম ধরে রশ্মি দুটি টানো A বিন্দু থেকে। দেখবে লেন্স পেরিয়ে রশ্মি দুটি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে, পরস্পর মিশবার কোন লক্ষণই নেই। ছড়িয়ে-পড়া রশ্মি দুটি মনে হচ্ছে যেন a বিন্দু থেকে আসছে, যদিও সত্যিতে মেশে নি। চোখে দেখলে A বিন্দুর প্রতিচ্ছবি a বিন্দুতে দেখা যাবে, ABর প্রতিচ্ছবি abতে দেখা যাবে। এ ক্ষেত্রে



45 নং চিত্র। বস্তু ফোকাল লেংথএর মধ্যে থাকলে বড়ো করে অপ্রকৃত প্রতিচ্ছবি (virtual image, magnified) দেখা যাবে। এই হলো ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিয়ম।

ab হলো অপ্রকৃত প্রতিচ্ছবি virtual image। আর দেখছো বস্তুর চেয়ে প্রতিচ্ছবি বড়ো। এভাবেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বড়ো করে দেখা যায়। প্রতিচ্ছবিটা এক্ষেত্রে সোজাই থাকে, উলটে যায় না। এই অপ্রকৃত প্রতিচ্ছবি শুধু চোখে দেখা যায়, কাগজের ওপর ধরা যায় না, কারণ সত্যিতে abতে কোনো আলোক রশ্মি এসে মেশে নি।

13. কনকেভ লেন্স দিয়ে কী করে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়? ছবিতে লেন্স ও AB বস্তু বসানো হয়েছে। দেখা যাক কোথায় প্রতিচ্ছবি পড়ে। A বিন্দু থেকে অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি টানো লেন্স অবধি। এই রশ্মি 10 নম্বর সূত্র অনুসারে অক্ষের বিপরীত দিকে বেঁকবে, মনে হবে

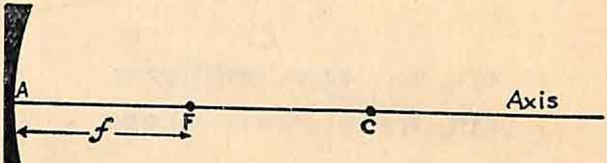


46 নং চিত্র। কনকেভ লেন্স দিয়ে বস্তুর
(AB) অপ্রকৃত প্রতিচ্ছবি (ab) সৃষ্টি।

যেন আগের ফোকাস বিন্দু F দিয়ে আসছে। এবার A থেকে আর একটা রশ্মি টানো যেটা লেন্সের কেন্দ্র দিয়ে সরাসরি বেরিয়ে যাবে, 11 নম্বর সূত্র। তাহলে লেন্স পেরিয়ে দুটি রশ্মি ছড়িয়ে পড়বে, মিশবে না। কিন্তু দেখলে মনে হবে এরা যেন a বিন্দু থেকে মিশে আসছে। তাহলে A বিন্দুর অপ্রকৃত প্রতিচ্ছবি virtual image হলো a বিন্দুতে; AB-র অপ্রকৃত প্রতিচ্ছবি হলো abতে। তাহলে দেখো, কনকেভ লেন্স দিয়ে সর্বদাই অপ্রকৃত প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়, প্রতিচ্ছবি সোজা থাকে, আর প্রতিচ্ছবি ছোটো হয়। একটা মাইনাস পাওয়ারের কনকেভ চশমা হাতে ধরে দেখলেই এই ব্যাপার দেখতে পাবে।

14. কনকেভ আয়নায় কী নিয়মসূত্র অনুসারে আলো প্রতিফলিত হয় জানলে বুঝতে পারবে কী করে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়। কনকেভ আয়না দিয়ে জোরালো প্রতিফলক দূরবীন তৈরী হয় সেকথা দশম অধ্যায়ে পড়েছো।

কনকেভ আয়নায় প্রতিফলিত করে সূর্যের আলো জড়ো করা যায়। আয়না থেকে যতো দূরে সূর্যের ফোকাস পড়ে সেটাই হলো ফোকাল লেংথ। ফোকাল লেংথএর দ্বিগুণ হলো গোল ডৌলের ব্যাসার্ধ, অথবা, ডৌল ব্যাসার্ধের



$$AF = FC$$
$$AF = f$$

47 নং চিত্র। কনকেভ আয়না। গোল ডৌলের কেন্দ্র C, অর্থাৎ AC= ডৌলের ব্যাসার্ধ (radius of curvature)। ফোকাস বিন্দু F, অর্থাৎ AF=ফোকাল লেংথ (f), অতএব ফোকাল লেংথ হলো ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

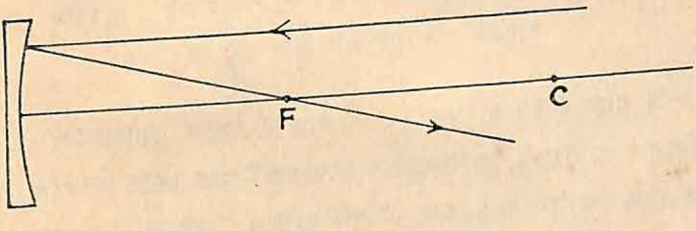
অর্ধেক হলো ফোকাল লেংথ। ছবিতে আয়নার ডৌলের কেন্দ্র (centre of curvature) হলো C, ফোকাস বিন্দু F। ফোকাস বিন্দু F পড়বে আয়না আর C র ঠিক মাঝামাঝি। সমান্তরাল আলো (সূর্যের, তারার বা খুব দূরের বস্তুর)

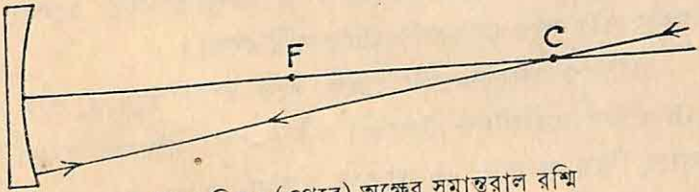
কনকেভ আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ফোকাস বিন্দুতে জড়ো হবে।

আয়না কাচেরমধ্য বিন্দু A থেকে ডৌলকেন্দ্র C তে সরল রেখা টানলে সেটাকে বলবে আয়নার অক্ষ axis of the mirror। 47 নং চিত্র দেখো।

15. কনকেভ আয়নায় অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি এলে প্রতিফলিত হয়ে ফোকাস বিন্দু দিয়ে যাবে (ছবি 48)।

16. যে রশ্মি ডৌলকেন্দ্র দিয়ে এসে কনকেভ আয়নায় পড়বে সেটা প্রতিফলিত হয়ে একই পথ ধরে ফিরে যাবে। (ছবি 49)



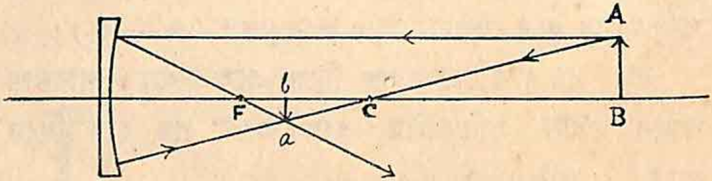


48 নং চিত্র। (ওপরে) অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে F দিয়ে যাবে।

49 নং চিত্র। (নীচে) ডৌল কেন্দ্র (C) দিয়ে রশ্মি এলে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে ফিরে যাবে

15, 16 সূত্র দুটি মনে রাখলে বুঝতে পারবে কনকেভ আয়নায় কী করে প্রতিচ্ছবি (image) সৃষ্টি হয়।

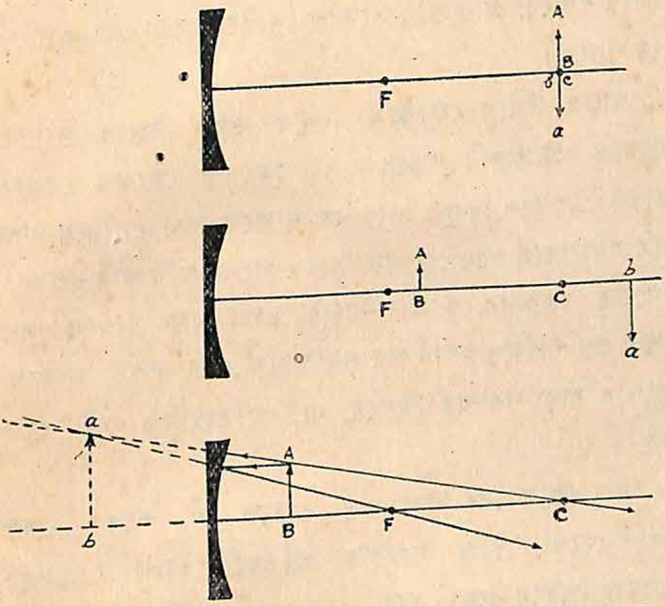
17, এই উদাহরণে দেখো কী ভাবে AB বস্তুর প্রতিচ্ছবি abতে সৃষ্টি হলো। প্রথমে A থেকে অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি টানো। প্রতিফলিত হয়ে এই রশ্মি ফোকাস বিন্দু F



50 নং চিত্র। কনকেভ আয়না দিয়ে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি। দূরবীন আয়নায় এভাবেই প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়।

দিয়ে যাবে (15 নং সূত্র)। এবার A থেকে ডৌলকেন্দ্র C দিয়ে রশ্মি টানো, প্রতিফলিত হয়ে একই পথে ফিরে আসবে। তাহলে প্রতিফলিত হয়ে ঐ দুটি রশ্মি a বিন্দুতে মিশেছে। এই ভাবে A বিন্দুর প্রতিচ্ছবি a বিন্দুতে সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ AB বস্তুর প্রতিচ্ছবি abতে সৃষ্টি হলো।

AB-কে ডৌলকেন্দ্র C থেকে দূরে রাখা হয়েছে, ফলে ab হয়েছে ছোটো ও উলটো। AB-কে আয়নার যতো কাছে নিয়ে আসবে ab ততোই আয়না থেকে দূরে গিয়ে ফোকাস হবে। বস্তুটাকে (AB) যদি ডৌলকেন্দ্র C-র ওপর রাখো, ঠিক সেখানেই উল্টো প্রতিচ্ছবি পড়বে। তখন AB ab সমান আকারের হবে।



51 নং চিত্র। (ওপরে) ডৌল কেন্দ্রের ওপর বস্তু (AB) থাকলে সেখানেই উল্টো হয়ে সমান আকারের প্রতিচ্ছবি (ab) পড়বে। (ডৌল কেন্দ্র C)
(মধ্যে) বস্তু (AB) C ও F এর মধ্যে থাকলে বড়ো হয়ে প্রতিচ্ছবি (ab) পড়বে।
(নীচে) ফোকাল লেংথএর মধ্যে বস্তু (AB) থাকলে বড়ো হয়ে অপ্রকৃত প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে আয়নার পিছনে।

বস্তুটাকে যদি আয়নার আরো কাছে নাও, অর্থাৎ C ও F এর মধ্যে রাখো, প্রতিচ্ছবি পড়বে C-র বাইরে। প্রতিচ্ছবি পড়বে বস্তুর চেয়ে বড়ো হয়ে। বস্তুকে যতো F এর কাছে

এগিয়ে বসাবে, প্রতিচ্ছবি ততোই পিছিয়ে বড়ো magnified হয়ে পড়বে।

আরও এগিয়ে ফোকাস বিন্দুর ওপর বস্তুকে রাখলে কোথাও প্রতিচ্ছবি পড়বে না। কনভেক্স লেন্সের বেলাও দেখেছ, ফোকাস বিন্দুর ওপর বস্তু থাকলে লেন্স পেরিয়ে রশ্মি গুলি সমান্তরাল হয়ে বেরোয়, তাই কোনো প্রতিচ্ছবি হয় না। কনকেভ আয়নার ফোকাস-বিন্দুর ওপর বস্তু রাখলে সব রশ্মিই প্রতিফলিত হবার পর সমান্তরাল হয়ে ঠিকরে আসবে, কোথাও তারা পরস্পর মিশবে না, প্রতিচ্ছবিও সৃষ্টি হবে না।

কিন্তু ফোকাসের মধ্যে বস্তু রাখলে কী হবে? শেষ ছবিতে দেখো, 'ABর অপ্রকৃত প্রতিছবি virtual image আয়নার পিছনে বড়ো হয়ে দেখাচ্ছে। দাড়ি কামানোর কনকেভ আয়নায় এই ভাবে মুখটা হাঁড়ির মতো বড়ো দেখায়। আয়নাটা মুখের সামনে ধরলে মুখটা আসবে ফোকাল লেংথএর মধ্যে, অমনি আয়নার পেছনে বড়ো ছবি দেখতে পাবে।

আমরাও হতে পারি

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক : বিদ্যুৎ-বিশারদ : দেবীদাস মজুমদার
দুই : মুদ্রণ-বিশারদ : অশোক ঘোষ
তিন : মোটর এঞ্জিনিয়ার : দেবীদাস মজুমদার
চার : বীক্ষণ-বিশারদ : কমলেশ রায়
পাঁচ : বিমান-বিশারদ : দেবব্রত বসু
ছয় : রেডিও-বিশারদ : জ্যোতির্ময় দে
সাত : ফোটোগ্রাফার : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ইত্যাদি ইত্যাদি

আমরাও হতে পারি—শুধু তাই নয়, আমাদেরও হতে হবে। কেননা আজ আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড যুগ-পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে—হাজার বছরের পুরোনো যে-অচল খোঁটায় আমাদের ভাগ্য বহুদিন বাঁধা পড়ে ছিলো তা উপড়ে ফেলে বিদেশী শাসনমুক্ত এই দেশকে শিল্পে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। আজ আর যন্ত্রকে ভয় পেয়ে বসে থাকা চলবে না—হাতের কাজকে ছোট মনে করবার, ঘৃণা করবার দিন নয় আর। তাই এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা। যাঁদের দিয়ে বইগুলি লিখিয়েছি তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের বিভাগে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের বলেছি : আপনাদের ওই জ্ঞানের ঐশ্বর্যই আজ একটা ঋণ হয়েছে—দেশের কিশোর-কিশোরীদের কাছে ঋণ। আপনারা যা জেনেছেন, শিখেছেন তা সহজ করে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে যন্ত্র-কৌশলের নানা বিভাগে ওরা সত্যিই আগামীকালের বিশারদ হয়ে ওঠে।

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক